

জীবন ও বৃক্ষ

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলাতেই পিতামাতা কুমিল্লায় চলে আসেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কুমিল্লাতেই অতিবাহিত করেন। ১৯৪৩ সালে বহিরাগত হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। পরে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে বিভিন্ন সরকারী কলেজে চাকুরি করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয় ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে। এ কারণে তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহে যুক্তিনিষ্ঠা এবং মুক্তবুদ্ধির পরিচয় বিশেষভাবে বিধৃত। একই সাথে তাঁর জীবন ও সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছিল ক্লাইভ বেল ও বার্ট্রান্ড রাসেলের দ্বারা। ক্লাইভ বেল রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ ‘সিভিলিজেশন’ এর তিনি সাবলীল অনুবাদ করেন। আর মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলের রচনাসমূহ তিনি গভীরভাবে আশ্রয় করেছিলেন। পরবর্তীকালে ক্লাইভ বেল ও বার্ট্রান্ড রাসেলের চিন্তাধারা ও রচনা তাঁর মানসিক গঠন ও সাহিত্য রচনায় বিশেষ ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর রচনা সংখ্যা খুবই অল্প। তিনি ছিলেন প্রবন্ধকার। ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে তিনি ছিলেন প্রায় অপরিচিত। জীবিত অবস্থায় তাঁর কোন লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। গুণগ্রাহী বন্ধুরা মৃত্যুর পর তাঁর রচনাবলীকে সংকলিত করে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে “সংস্কৃতি কথা” নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন বের করেন। এটিই তার একমাত্র গ্রন্থ। তিনি যেমন লিখতেন কম, তেমনি খুব অল্প কথায় বক্তব্য প্রকাশের একটি ব্যতিক্রমী ক্ষমতা ছিল তাঁর। সৃষ্টি পরিমাণগত দিক থেকে নয়, গুণগত দিক থেকে বিচার্য। এদিক থেকে বিচার করলে তিনি বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদের বাংলা সাহিত্যের কৃতি প্রবন্ধকারদের মধ্যে অন্যতম। মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন যুক্তিবাদী। তবে একই সাথে তিনি ছিলেন জীবন রসের রসিক। এ কারণেই বলা হয় তাঁর গদ্যরচনা “বুদ্ধির দীপ্তিতে পরিচ্ছন্ন এবং স্মিতরসে স্নিগ্ধ।”

ভূমিকা

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি ‘সংস্কৃতি কথা’ গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে লেখক বৃক্ষের পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে মানবজীবনের তুলনা করেছেন। গাছ বিকাশশীল। অঙ্কুরোদগমের পর্যায়ে থেকে শুরু করে নানা রূপান্তর ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বৃক্ষ এক সময় পূর্ণতা পায়। তাতে ফুল ধরে, ফল হয়। মানবজীবনও একই রকম। কেবল বেঁচে থাকাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। বৃক্ষ যেমন ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়, তেমনি মানুষও বিভিন্ন সদগুণের অধিকারী হয়ে অন্যের প্রেমে, সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার মাঝেই পরিপূর্ণ সার্থক হয়। লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মানব জীবনের সঙ্গে বৃক্ষের তুলনা করেছেন। তাই প্রবন্ধটির ‘জীবন ও বৃক্ষ’ নামকরণ সার্থক হয়েছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য


১. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রবন্ধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
২. লেখকের যুক্তিবাদী মন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ◆ সমাজের বেশিরভাগ মানুষের চরিত্র কেমন তা বলতে পারবেন।
- ◆ বৃক্ষ কেন মানুষের জীবনাদর্শের প্রতীক হবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।


	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।
---	--

শব্দার্থ	মূলপাঠ
<p>স্বল্পপ্রাণ – ক্ষীণজীবী।</p> <p>স্থূলবুদ্ধি – যাদের বুদ্ধি কম বা বোকা।</p> <p>জবরদস্তি প্রিয় – যে অন্যের ওপর জোর খাটাতে ভালবাসে।</p> <p>অন্তরায় – বাধা।</p> <p>বিকৃত বুদ্ধি – অসৎবুদ্ধি।</p> <p>নিশান – পতাকা।</p> <p>উপলব্ধি – গভীর অনুভূতি।</p> <p>সূক্ষ্মবুদ্ধি – জীবনের জটিল বিষয়ও বুঝতে পারার মতো বুদ্ধি।</p> <p>প্রতীক – কোন কিছুকে বা জিনিসকে বোঝানোর জন্য যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।</p>	<p>সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে অগ্রহ জাগিয়ে দেয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহঙ্কার। তারই চরণে তারা নিবেদিত-প্রাণ। ব্যক্তিগত অহঙ্কার, পারিবারিক অহঙ্কার, জাতিগত অহঙ্কার— এ সবার নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানব প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাসূন্য, উপলব্ধিহীন বুলি।</p> <p>এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষ-সূক্ষ্মবুদ্ধি উদার হৃদয় গভীর-চিত্ত ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল টিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কল নয়, সজীব বৃক্ষ-যার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না।</p> <p>বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।</p>

সার-সংক্ষেপ

মানুষকে বিকশিত হতে সাহায্য করাই সমাজের কাজ। পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষই কেবল নিজের জন্য চিন্তা করে। তাই তারা নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তো তোলেই না, বরং অন্যের সার্থকতার পথেও বাধা সৃষ্টি করে। এ সমস্ত মানুষ সব সময় অহঙ্কারে মত্ত থাকে। মাঝে মাঝে তারা মানব প্রেমের কথাও বলে, কিন্তু তা আন্তরিকতাসূন্য। পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা কমিয়ে এদের জায়গায় আনতে হবে উদার হৃদয়ের ব্যক্তি। যাদের উদ্দেশ্য সমাজে কেবল টিকে থাকা নয়, বরং জীবনকে সুন্দরভাবে বিকশিত করা। লেখকের মতে এদের জীবনাদর্শের প্রতীক হবে সজীব বৃক্ষ। কারণ মানব জীবনের আদর্শ হিসেবে বৃক্ষের মতো জীবন্ত উপমা আর নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।
---	--

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সমাজের বেশির ভাগ মানুষের চরিত্র কেমন হয়?
২. “বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়” – লেখকের এ উক্তি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন : “বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়” – লেখকের এ উক্তি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী ‘জীবন ও বৃক্ষ’ গ্রন্থের তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রথমেই বৃক্ষের দিকে তাকালে কেন জীবনের সার্থকতা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় সে সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এ পৃথিবীতে কেবল কোনরকমে বেঁচে থাকাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। জীবনকে পরিপূর্ণ বিকশিত করে অন্যের জন্যে কিছু করার মন মানসিকতা মানুষের থাকা উচিত। গতিশীল, বিকশিত ও সেবাপরায়ণ জীবনই মানুষের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে বৃক্ষের কোনও মহৎ ও সেবাপরায়ণ আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু গভীর ভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় বৃক্ষের জীবন পুরোপুরি অন্যের জন্যে নিবেদিত। তার ছায়া, ফুল, ফল সবই অন্যের জন্যে। ফুলের সুগন্ধ বৃক্ষ নয়, মানুষের জন্যে, ফলও মানুষের জন্যে, ছায়াও মানুষের জন্যে। তাই কেবল মাটি থেকে রস গ্রহণ করে বিশালাকার হওয়াতেই গাছের সার্থকতা নয়, যেদিন গাছটিতে ফুল হয়, ফল ধরে সেদিনই গাছ হয় পরিপূর্ণ। গভীর অভিনিবেশসহ গাছকে লক্ষ করলে তাই বলা যায় বৃক্ষই মানব জীবনের সবচেয়ে সার্থক প্রতীক। গাছে আছে একসঙ্গে সজীবতা ও সার্থকতা।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ◆ লেখকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত পার্থক্য সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা লিখতে পারবেন।
- ◆ লেখক বৃক্ষকে কেন মানব জীবনের প্রতীক মনে করেন তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
মনুষ্যত্ব – দয়া, ধর্ম, প্রেম ইত্যাদি মানবোচিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য।	অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধি হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়-তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তপোবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন না বোঝা মুশকিল।
ডিঙানো – লাফিয়ে পার হওয়া।	
তপোবন – তপস্যার জন্যে যে বন।	
অনুভূতিরচক্ষু – সংবেদনশীল মনের চক্ষু।	
ধেয়ে চলা – এগিয়ে চলা।	
নতি – আনত, নম্র, নিচের দিকে নিবদ্ধ।	জানি, বলা হবেঃ নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে উঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানোয় তা তত স্পষ্ট হয়ে উঠে না। তাই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।

আত্মবিসর্জন — পরের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন।
পতিত — পড়ে যাওয়া, ঝরে যাওয়া।

টীকা

তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ
প্রাচীন ভারতে মুনি-ঋষিরা বনের মাঝে আশ্রম তৈরি করে থাকতেন। সেখানেই সাধনা করতেন। আবার সেই আশ্রমে গুরুর শিষ্য (ছাত্র, শিক্ষার্থী) দের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া হত। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতের তপোবন-জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ তা তার বহু রচনায় বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক নগর সভ্যতা থেকে দূরে প্রকৃতির সান্নিধ্য পাবার উদ্দেশ্যে তিনি বোলপুরে শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রথম অবস্থায় আশ্রমের মতোই পড়াশোনা হত। তাই লেখক বলেছেন ‘তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ’।

উত্তরে বলব ঃ চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনার যেমন একটা ধীর স্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনায়ও তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি? অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাইনা। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।


সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। নদীর সাগরের পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে উঠে না। সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন। অপরপক্ষে বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় : এইতো সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাপ্তি, তাই তার দান।

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেনি। বললে ভালো হতো। তাহলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম।

সার-সংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের জীবনকে ফুল ফোটার সাথে তুলনা না করে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ ফুল ফোটা সহজ, কিন্তু নদীকে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়। ফুল ফোটানোর জন্য গাছের যে দীর্ঘ সাধনা তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু নদীর উৎস থেকে সমুদ্রে পতিত হওয়ার আয়োজন দেখা যায়। নদীর সাগরে পতিত হওয়ার দৃশ্য আমরা প্রত্যহ দেখি না, কিন্তু গাছকে আমরা সহজে দেখি। নদী ক্রমাগত এগিয়ে চলে, কিন্তু বৃক্ষের সার্থকতার পেছনে রয়েছে ধীর-স্থির নীরব সাধনা। নদী যখন সাগরে পতিত হয় তখন সে সমুদ্রে একাকার হয়ে যায়, তখন আর তার নিজস্ব কোন সত্তা থাকে না বলে নদীর সাধনায় প্রাপ্তিযোগ নেই। কিন্তু বৃক্ষের সাধনায় সিদ্ধি রূপ ফুল ও ফল সে পরের জন্য দান করে। সৃষ্টিধর্মী মানুষও জীবনে সাধনা করে সার্থকতা লাভ করে। জ্ঞানকে নিজস্ব সম্পদ করে না রেখে অপরের জন্য দান করেন বলেই লক্ষ লক্ষ মনিষীর জ্ঞান ও সাধনার সম্পদে মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। তাই লেখক মনে করেন বৃক্ষই সার্থক জীবনের প্রতীক হওয়া উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	<p>নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।</p>
---	---

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. রবীন্দ্রনাথ কেন নদীর গতির মধ্যে মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখেছেন ব্যাখ্যা করুন।
২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী কেন নদীর চেয়ে বৃক্ষকেই আদর্শ জীবনের প্রতীক মনে করেছেন তা আলোচনা করুন।

প্রশ্ন : মোতাহের হোসেন চৌধুরী কেন নদীর চেয়ে বৃক্ষকেই আদর্শ জীবনের প্রতীক মনে করেছেন তা আলোচনা করুন।

উত্তর : মোতাহের হোসেন চৌধুরী ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বহু রচনায় জীবনের সঙ্গে নদীর তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ফুলের ফোটা এবং নদীর গতি দুটো তুলনা করে মনুষ্যত্বের সঙ্গে নদীরই অধিক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মনে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই অভিব্যক্ত হয়। নদীর গতি সরল নয়, তাকে বহু বাধা পেরিয়ে চলতে হয়। মানব জীবনও বন্ধুর। আনন্দ-বেদনা ভাল মন্দ মিলিয়েই সমগ্র জীবন। কিন্তু লেখক রবীন্দ্র-অনুসারী হয়েও এটা মানতে পারেননি। কেননা নদী যখন সাগরে মিলিত হয়, তখন নদীর নিজস্ব কোনও সত্তা থাকেনা, কিংবা কোনও বৈশিষ্ট্যও থাকেনা। সাগরই তখন মুখ্য। লেখকের মতে এটা নদীর আত্মসর্জন। কিন্তু বৃক্ষের প্রাপ্তি আমাদের চোখের সামনে ছবির মতোই ফুটে ওঠে। ফুলে-ফলে গাছ যখন ভরে ওঠে তখন তার সাধনা ও সার্থকতার দিকটি আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। বৃক্ষের প্রাপ্তি ও দানে কোন ভেদ নেই। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে কোনো ভেদ নেই। ফলে আমরা এক পরিপূর্ণ মানবসত্তাকেই প্রত্যক্ষ করি। তাই লেখক জীবনের সঙ্গে নদীর চেয়ে বৃক্ষেরই অধিক মিল খুঁজে পেয়েছেন।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- ◆ প্রকৃতি ও মানুষের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ বস্তু জিজ্ঞাসা বা বিজ্ঞান কেন শিক্ষার প্রধান বিষয় হতে পারে না তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
<p>আত্মিক – আত্মসম্বন্ধীয়।</p> <p>পরিপক্বতা – পূর্ণ পরিণতি।</p> <p>বস্তু জিজ্ঞাসা – পদার্থ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা।</p> <p>মূল্যবোধ – জীবনের মূল মর্যাদা সম্বন্ধে ধারণা।</p> <p>জীবনবোধ – জীবনের স্বরূপ সম্পর্কিত উপলব্ধি।</p>	<p>নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে, বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলাতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিক ও মানুসকে আত্মসৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা, তাইতো আত্ম এ আত্মপ ফল স্রষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় :</p> <p>Ripeness is all—পরিপক্বতাই সব। আত্মিক মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে তা স্রষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্ম পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের সাধনাই</p>


	<p>মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তু-জিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্ম উন্নতি হয় না-জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয় না; তা হয় সাহিত্য-শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এতো মূল্য।</p> <p>উপরে যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নিদর্শন। বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি-জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে।</p> <p>বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়-প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে।</p>
--	---

সার-সংক্ষেপ

বৃক্ষ নীরবে আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। জীবজন্তু ও তরুলতার জীবন বিকাশে তাদের নিজস্ব কোনো হাত নেই। কিন্তু মানুষের বিকাশে তার নিজস্ব হাত আছে। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। নিবিড় প্রেম ও সুগভীর অনুভূতির দ্বারাই মানবাত্মা পরিপুষ্টি ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। বস্তুজিজ্ঞাসা কিংবা বিজ্ঞানশিক্ষা কখনও আত্মনির্মাণ প্রক্রিয়ার উপযোগী নয়। সাহিত্য ও শিল্পকলাই এজন্য সবিশেষ উপযোগী।

মানুষকে ছায়া দেয়, ফল দান করে। গাছ তার বেড়ে ওঠার প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত। বৃক্ষের দিকে তাকালে তাই আমরা মানব জীবনের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে সচেতন হই। তাই বিকশিত বৃক্ষই হয়ে উঠতে পারে মানব জীবনের প্রাপ্তি, প্রশান্তির রূপক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	<p>নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।</p>
---	---

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- বস্তু জিজ্ঞাসা বা বিজ্ঞান কেন শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না?
- “প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির উপরে তার নিজের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে।” কোন উপলক্ষে এবং কেন লেখক এ মন্তব্য করেছেন? এর তাৎপর্য কী?

প্রশ্ন : “প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষেরও সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির উপরে তার নিজের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে।” কোন উপলক্ষে এবং কেন লেখক এ মন্তব্য করেছেন? এর তাৎপর্য কী?

উত্তর : প্রকৃতির ধর্ম ও মানুষের ধর্ম এক হলেও দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্য নির্দেশ করতেই মোতাহের হোসেন চৌধুরী তার ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে উদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছেন। তরুলতা ও জীবজন্তুর মধ্যে বৃদ্ধির প্রবণতা আছে। কিন্তু এ বৃদ্ধি একান্তই প্রকৃতির নিয়মে হয়, সে বৃদ্ধির ওপর তাদের কোনো হাত নেই। কিন্তু মানুষের বৃদ্ধি তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষের সবচেয়ে সারবান বস্তু তার আত্মা সুখ-দুঃখ বেদনা বিষাদের মধ্য দিয়ে মানুষ তার যে অন্তর্গত সত্তার সন্ধান পায় সেই চৈতন্যই হচ্ছে আত্মা এ মানবাত্মতৈরি কিংবা কিনতে পারা যায় না বা এটা প্রকৃতির নিয়মে পাওয়া যায় না। মানুষকে তা একান্ত সাধনা ও পরম নির্ণায়ক মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। এ জন্যই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষ মর্যাদা পেয়েছে। প্রকৃতি জগতের অন্যান্য জীবজন্তু বা তরুলতার দ্বারা তা সম্ভবপর নয়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সমাজের কাজ কেবল টিকিয়া থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে দেয়া।
২. মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিক।
৩. বৃক্ষ কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়, প্রশান্তিরও ইঙ্গিত।
৪. সেতো প্রাপ্তি নয়, আত্মসর্জন।

সমাজের কাজ কেবল টিকিয়া থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে দেয়া।

আলোচ্য অংশটুকু মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'জীবন ও বৃক্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত। মানবজীবনে সমাজের অবদান ও ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক উক্তিটি করেছেন।

মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি। মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ বিকশিত করাই সমাজের কাজ। কিন্তু মানব সমাজে বেশির ভাগ ব্যক্তিই অত্যন্ত স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণমনা। এরা নিজের জীবন যেমন সার্থক ও সুন্দর করে তোলেনি, তেমনি আবার অন্যের বিকাশের পথেও তারা বাধার সৃষ্টি করে। প্রেম ভালবাসা বঞ্চিত বলে এসব ব্যক্তি নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধির অধিকারী হয়। এরা কেবল আত্মহিংসার দ্বারা চালিত। মাঝে মাঝে স্বার্থের কারণে মানব প্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাদের অন্তঃসারশূন্য চরিত্রের কারণে তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না।


লেখকের মতে সমাজে কেবল মানুষ হিসেবে বেঁচে থেকে নিজের স্বার্থ দেখলে তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যাবে না। মানুষকে হতে হবে স্ফূর্তিবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রেম-ভালবাসা পূর্ণ ও উদারহৃদয়। তখনই মানুষ পরের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারবে। কাজেই মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে সমাজের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সমাজ থেকে স্থূলবুদ্ধি ও বিকৃতবুদ্ধির মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য সমাজ থেকে অশুভ ও অকল্যাণবোধ দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

সেতো প্রাপ্তি নয়, আত্মসর্জন।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'জীবন ও বৃক্ষ' নামক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। নদী ও বৃক্ষের সাধনার পার্থক্য নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক এ উক্তিটি করেছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনের সঙ্গে নদীর গতির সাদৃশ্য দেখে মনুষ্যত্বের সঙ্গে নদীর তুলনা করেছেন। লেখক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজের মত-পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনের উদ্দেশ্য কেবল নদীর মতো ক্রমাগত এগিয়ে চলা নয়। সাধনার সফলতার পর প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। সাধনায় যদি কোনো সিদ্ধি না থাকে তবে সাধনার দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হবেন না। কিন্তু নদীর জীবনে এ প্রাপ্তি জিনিসটা চোখে দেখা যায় না। নদী সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে যখন তার সাধনায় সফলতার চরম সীমায় পৌঁছে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন নদী নিঃশেষিত হয়ে যায়। নদীর আর কোনো বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় থাকে না, সাগরের পরিচয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। নদী তাই সাগরে মেলে না, আত্মসর্জন দেয়। এখানে নদীর কোনো প্রাপ্তি নেই। অথচ বৃক্ষের সাধনা ও প্রাপ্তি আমরা সহজে দেখতে পাই। বৃক্ষ যখন ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন বোঝা যায় তার এতদিনের নীরব সাধনার সার্থকতা। তাই লেখক নদীর সাগরে মিলিত হওয়াকে সাধনার প্রাপ্তি না বলে আত্মসর্জন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যেসব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।
---	---

- জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধের নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
- জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য লিখুন।

প্রশ্ন : জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য লিখুন।

উত্তর : “জীবন ও বৃক্ষ” শীর্ষক প্রবন্ধটি মোতাহের হোসেন চৌধুরীর গ্রন্থ “সংস্কৃতি কথা” থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ প্রবন্ধে তিনি বৃক্ষকেই মানব জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে সে আলোকেই জীবন-রচনার আহ্বান জানিয়েছেন। বৃক্ষের দিক থেকে মানবজীবনের সঙ্গে বৃক্ষের সাদৃশ্য রয়েছে। অঙ্কুরোদগমের পর্যায় থেকে শুরু করে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গাছ একদিন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তাতে ফুল ধরে, ফল হয়। তখনই গাছ হয় সার্থক। কেবল মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে ক্রমশ বড় হয়ে ওঠাতেই বৃক্ষের সার্থকতা নয়। তাকে ফুল ফোটাতে ও ফল ধরাতে হয়। একাজ একদিনে হয় না, দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষাতেই এ কাজ সম্পূর্ণ হয়। গাছের এ সাধনার সঙ্গে মানুষের অধ্যবসায়ের মিল রয়েছে। মানুষের কেবল বেঁচে থাকার জন্য জীবন যাপন করা উচিত নয়। প্রথম থেকেই তার অন্যের কল্যাণ কামনা করার মন-মানসিকতা থাকা দরকার। এভাবেই মানুষের জীবন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়।

প্রবন্ধকার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যুক্তির অবতারণা করেছেন। ফুলের ফোটা ও নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের মিল খুঁজে পেয়েছেন। বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে নদী একদিন সমুদ্রে পতিত হয়। মানবজীবনও এমনই কঠিন। শৈশব থেকে বার্ষিক পর্যন্ত তাকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। আনন্দ বেদনা, ভাল-মন্দ মিলেই জীবন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু নদী কখনও মানব জীবনের উপমা হতে পারে বলে লেখক মনে করেন না। যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, নদী সাগরে মিলিত হলে নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন নদীর আর কোনো বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় থাকে না, সাগরের পরিচয়েই তার পরিচয়। নদী তাই সাগরে মিলিত হয় না, আঙ্গির্সর্জন দেয়। কিন্তু বৃক্ষের প্রাপ্তি আমাদের চোখের সামনে ছবির মতোই ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে গাছ যখন ভরে যায়, তখন তার সাধনা ও সার্থকতার দিক দুটোই আমরা সহজে বুঝতে পারি। বৃক্ষের প্রাপ্তি ও দানে তাই কোনো ভেদ নেই। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে কোনো পার্থক্য নেই। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের পর দীর্ঘ সময় ধরে, বৃক্ষ প্রতীক্ষার পর একদিন ফুলে-ফলে সার্থক হয়। মানুষও তার সাধনার প্রথম স্তর পার হয় নীরবে এবং গোপনে। তারপর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলে সবাই তা জানতে পারে। সাধনার পর যা তার প্রাপ্তি, তা কেউ নিজের করে রাখে না; দান করে মানব কল্যাণে। বৃক্ষ জীবনেও তাই। সাধনার পর ফুলের সৌরভ, ফলের স্বাদ কোনোটাই গাছ নিজের জন্য রাখে না, সবই মানুষের জন্যে। এভাবে বিচার করলে দেখা যায় নদীর চেয়ে বৃক্ষই মানুষের জীবনাদর্শ হওয়ার জন্য শ্রেয়। তাছাড়া বৃক্ষের সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কারণ প্রতিদিনই আমরা গাছ দেখি। নদীকে দেখা কিংবা তার সাগরে মিলিত হবার দৃশ্য আমরা এত সহজে দেখতে পারি না। অথচ একটি পরিপূর্ণ বিকশিত বৃক্ষ প্রতিদিন আমাদের মানবজীবনের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। আমরা বুঝতে পারি কেবল নিজের জন্য জীবন নয়; আমরা সবাই যদি নিজেকে অন্যের কল্যাণের জন্য তৈরি করতে পারি, তবেই হবে মানব জীবনের সার্থকতা। তাই লেখক যথার্থই বলেছেন, “নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়ে।”

আরও যা পড়তে পারেন-

মোতাহের হোসেন চৌধুরীকে ভাল করে বোঝার জন্য লেখকের ‘সংস্কৃতি কথা’ গ্রন্থটি পড়তে পারেন।

বই কেনা

সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখক পরিচিতি

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর পিতার কর্মস্থল তদানীন্তন বৃহত্তর সিলেট জেলার করিমগঞ্জ (বর্তমান ভারতের কাছাড় জেলার অন্তর্গত) শহরের নাটখাল এলাকায় সৈয়দ মুজতবা আলী জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতা খান সিকন্দর আলী ও মাতা আমতুল মনুন খাতুন।

শিক্ষানুরাগের পারিবারিক পরিবেশে এবং নবোদ্ভূত মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের উদার ও উচ্চ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রজীবন শুরু হয় সুনামগঞ্জ শহরের একটি বিদ্যালয়ে, এরপর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৌলবীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পিতার বদলির সূত্রে সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে যষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, কিশোর মুজতবা তার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন। এরপর নিজ উদ্যোগে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্র-যোগাযোগ শুরু করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় সিলেটের তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ মুজতবা আলীর শিক্ষাজীবনে বিপ্লব ঘটায়, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই, পিতার অবাধ প্রশয়, দুই অগ্রজের সম্মতি ও অনুপ্রেরণা এবং সতীর্থদের শুভেচ্ছা সম্বল করে সৈয়দ মুজতবা আলী সিলেট থেকে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মুজতবা শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যয়নে নিয়োজিত ছিলেন। বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিক্ষালাভ তাঁর জীবনের এক বড় প্রাপ্তি। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মুজতবা আলী জার্মানের বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ডক্টর অব ফিলসফি উপাধি অর্জন করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর কর্মজীবন ছিলো বিচিত্রমুখী। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় আফগানিস্তানের শিক্ষাবিভাগের চাকুরি দিয়ে। এরপর মধ্যবর্তী বিরতিসহ বরোদা কলেজে ‘তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব’ বিষয়ে অধ্যাপনা এবং বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন (১৯৪৯-৫০)। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মুজতবা আলী দিল্লীস্থ ‘ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স’-এ সচিব পদে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সালে ঐ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’-তে চাকুরি নেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ‘অল ইন্ডিয়া রেডিও’র চাকুরিতে ইস্তফা দেয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন পাটনা স্টেশনের ‘স্টেশন ডিরেক্টর’। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগস্ট তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে রীডার পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশ্বভারতী থেকে অবসর গ্রহণ করে সার্বক্ষণিকভাবে সাহিত্যসেবায় আঙ্গিয়োগ করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী ভ্রমণ ও রম্যসাহিত্য রচয়িতা হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক পরিচিত। বাংলা গদ্যে এক বিশেষ বাকভঙ্গির প্রবক্তারূপে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বহুভাষাবিদ মুজতবা আলী বৈঠকি ঢঙে সাহিত্যে বিদ্রূপ ও কৌতুক এবং এর সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছেন বৈদম্ব্যের।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জন্মভূমি স্বাধীন বাংলাদেশে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিজি হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর উল্লেখযোগ্য রচনা

দেশে বিদেশে (১৩৫৬), পঞ্চতন্ত্র ১ম ও ২য় খন্ড (১৩৫৯, ১৩৭৩), চাচাকাহিনী (১৩৫৯), ময়ূরকণ্ঠী (১৩৫৯), জলেডাঙ্গায় (১৩৬৩), শবনম (১৩৬৭), ভবঘুরে ও অন্যান্য (১৩৬৯), টুনিমেম (১৩৩), তুলনাবীনা (১৩৭৪)।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করবেন।
- লেখকের অসাধারণ বাকপটুত্ব ও পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় লাভ করবেন।
- বাঙালি জীবনের কিছু ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কথা জানতে পারবেন।

ভূমিকা

“বই কেনা” প্রবন্ধটি সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব (১৩৫৯) থেকে সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, কিন্তু এর পরিবেশনা পরিহাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ দিয়ে সাজানো। মুজতবা সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো— তিনি গুরু বিষয়কে লঘু চালে উপস্থাপন করে পাঠক-বিবেককে জাগিয়ে তোলেন। তাঁর রচনায় কৌতুক বিদ্রূপ এবং পরিহাসের বৈঠকি আলাপচারিতার আবরণ থেকে বৈদগ্ধ্যের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। বিষয় ও শৈলীর এ ‘মণিকাঞ্চন যোগ’ বাংলা গদ্যে সুলভ নয়। সৈয়দ মুজতবা আলী তাই বাংলা গদ্য সাহিত্যের চর্চায় এক বিরল ব্যতিক্রম।

“বইকেনা” প্রবন্ধে বাঙালি চরিত্রের জাতিগত দীনতার একটি দিক কৌতুক ও বিদ্রূপের আবরণে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

এ প্রবন্ধে একদিকে যেমন বাঙালির স্বভাব জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসবোধের স্বীকৃতি আছে, অন্যদিকে তেমনি তার বই কেনার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অনীহার কথাও অকপটে ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজ জীবনে বইয়ের ভূমিকা, মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বইয়ের অবদান অত্যন্ত রসালো ভাষায় ও যুক্তি দিয়ে বর্ণনা করেছেন লেখক। বাঙালির বইকেনার ক্ষেত্রে অনীহার অবসান কামনাই ‘বই কেনা’ প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে লেখককে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- আনাতোল ফ্রাঁস-এর অনুসরণে মনের চোখ প্রসারিত করার উপায় সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- মনের চোখে ফোটানোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে বইয়ের গুরুত্ব বিচার করতে পারবেন।
- বাঙালি-চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।



মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মাছি-মারা কেরানী – যে কর্মচারী বিচার না করে অন্ধভাবে কাজ করে যায়।	মাছি-মারা-কেরানী নিয়ে যত ঠাট্টা রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত, সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক সময় উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে দুটো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো আছে বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।
পর্যবেক্ষণশীল – যিনি ভাল করে দেখেন।	তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, “হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবাল, বিস্তৃত এ সুন্দরী ধরণীর
চক্রাকার – চাকার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট।	
আনাতোল ফ্রাঁস – ফরাসি	

<p>সাহিত্যিক। জন্ম ১৮৪৪, মৃত্যু ১৯২৪। প্রকৃত নাম সানকোয়েজ আনতোলে থিবোল্ট। গল্প, রাজনৈতিক উপন্যাস এবং রাজনৈতিক ব্যঙ্গ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিখ্যাত গ্রন্থ খেইস (১৮৯০), জোকাস্টে এটলী চ্যাট সেইগ্রে (১৮৭৯), এল ওরমে ডু মেইল (১৮৯৭)।</p>	<p>সম্পর্গ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।” কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায় এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপসোস ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এখানেই ফ্রান্সের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রান্স সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, “কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পর্গ আমার হাতে। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।”</p>
<p>আচক্রবাল – দিগন্তবৃত্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ধরণী – পৃথিবী।</p>	<p>পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই। চোখ বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমত বই পড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।</p>
<p>সান্ত্বনা – আশ্বাস, প্রবোধ। আরব্য উপন্যাস – আরবদেশীয় উপাখ্যান। প্রবৃত্তি – স্পৃহা।</p>	<p>মনের চোখ ফোটানোর আরো একটি প্রয়োজন আছে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, “সংসারে জ্বালা যল্ণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর আপন ভুবন-সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেয়া।” যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযল্ণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।</p>
<p>বারট্রান্ড রাসেল – জন্ম ১৮৭২, মৃত্যু ১৯৭০। পৃথিবী-বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক। যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনের সক্রিয় নেতা। বিখ্যাত গ্রন্থ ‘পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস’।</p>	<p>অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল-আরো কত কি! কিন্তু প্রশ্ন, এ অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে? বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশভ্রমণ করার মতো সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন—</p>
<p>ভবযল্ণা – জীবনযল্ণা। দর্শন – যুক্তি ও প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানশাস্ত্র।</p>	<p>Here with a loaf of bread beneath the bough, A flask of wine, a book of verse and thou, Beside my singing in the wilderness And wilderness is Paradise Enow</p>
<p>ওমর খৈয়াম – জন্ম খ্রি ১০৭৫, মৃত্যু ১১২৩। ফারসি ভাষার বিশ্ববিখ্যাত কবি। তাঁর রচিত বিশেষ এক ধরনের চতুস্পদী কবিতার সংকলন ‘রুবাইয়াত’। তিনি একাধারে দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ।</p>	<p>রুটি মদ ফুটিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেননি। আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কুরআনের সর্বপ্রথম যে বাণী হয়রত মুহাম্মদ (স) শুনতে পেয়েছিলেন, তাতে আছে, ‘আল্লামা বিল কালাম’ আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন ‘কলমের মাধ্যমে। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তক কে।</p>
<p>"Here with ... Paradise Enow" – ওমর খৈয়াম-এর এ রুবাইটির অনুবাদক এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড (১৮০৯-৮৩)।</p>	<p>বাইবেল শব্দের অর্থ বই— Per Excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক – The Book. যে-দেবকে সর্ব মঙ্গলকর্মের প্রারম্ভে বিদ্বহস্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি ‘গণ’ অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেশভ্রষ্ট হবে।</p>
	<p>কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা— “অত কাঁচা</p>

<p>পয়সা কোথায় বাওয়া যে বই কিনব”। কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য— কনিষ্ঠ পরিমাণ লুকানো রয়েছে। সেটুকু এ যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস্। এর বেশি কিছু নয়।</p>
--


সার-সংক্ষেপ

মাছির মাথায় নাকি অনেক চোখ বসান আছে। তাই সে একইসঙ্গে চারদিকের সবকিছু দেখতে পায়। মাছির মতো এত চোখ মানুষের নেই বলে আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করেছেন। কিন্তু একই সাথে সান্ত্বনাও লাভ করেছেন এ বলে যে মানুষের মনের চোখ তো দুটি হয়। যত ইচ্ছা ততই মনের চোখ বাড়ান যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আয়ত্ত করা যায় ততই একটি একটি করে মনের চোখ ফুটতে থাকে।

চোখ বাড়ানোর প্রধান উপায় বই পড়া। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, সংসারের জ্বালা যল্ণা এড়াবার জন্য মনের ভুবন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আর মনের ভুবন সৃষ্টি করতে হলে পড়তে হয় বই। কবি ওমর খৈয়াম বেহেশতের ফিরিস্তি বানাতে যেয়ে বই-এর কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ধর্মে ‘আল্লামা বিল কালাম’ বলে পুস্তকের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ পুস্তক। হিন্দুধর্মে গণের দেবতা অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা গণপতি ভারবহন করেন গ্রন্থ রচনার।

সবধর্মের বই-পুস্তকের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতি নাকি বই কেনে না পয়সার অভাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	<p>নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।</p>
---	---

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- আনাতোল ফ্রাঁস মনের চোখ প্রসারিত করার কী উপায় নির্দেশ করেছেন?
- প্রবন্ধকারের অনুসরণে মাছি ও মানুষের মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।
- মনের চোখ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে লেখক কী মন্তব্য করেছেন?
- ওমর খৈয়াম তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বর্গকে কী কী সরঞ্জাম দিয়ে সাজিয়েছেন?
- ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থসমূহে বইয়ের গুরুত্ব কীভাবে নির্দেশ করা হয়েছে?
- বারট্রান্ড রাসেলের অনুসরণে মনের চোখ প্রসারিত করার আবশ্যিকতা ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : আনাতোল ফ্রাঁস মনের চোখ প্রসারিত করার কী উপায় নির্দেশ করেছেন?

উত্তর : মাছির মাথার চারদিকে গাদা গাদা চোখ বসানো থাকার কারণে মাছি একসঙ্গে সবদিক দেখতে পায়। কিন্তু দুচোখ থাকার কারণে মানুষ কেবল তার সামনের বস্তুকে দেখতে পায়। ফরাসি সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁস মানুষের এ সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে প্রথমে আপসোস করলেও, পরে এ সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, মানুষের আছে মনের চোখ। মনের এ চোখকে সংকুচিত-প্রসারিত করা মানুষেরই এখতিয়ারভুক্ত। মানুষ তার জানার আকাঙ্ক্ষাকে তুষ্ট করার জন্য যতোই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করবে, ততোই তার মনের চোখ প্রসারিত হতে থাকবে। মাছি অনেক চক্ষুবিশিষ্ট হলেও সে হৃদয়শূন্য। পক্ষান্তরে মানুষ দুই চক্ষুবিশিষ্ট হলেও বিশাল মনের অধিকারী। মনের চোখকে প্রসারিত করার জন্য মানুষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, চর্চার মাধ্যমে অসংখ্য মনের চোখকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

প্রশ্ন : প্রবন্ধকারের অনুসরণে মাছি ও মানুষের মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : শিক্ষিত বাঙালি সমাজে ‘মাছিমারা কেরানি’ বহুল প্রচলিত একটি প্রবচন। যে কর্মচারী শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার না করে অন্ধভাবে কাজ করে যায়; শিক্ষিত বাঙালিসমাজে তাকেই বলা হয় মাছিমারা কেরানি। এ শ্রেণীর কর্মচারীর বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিত্বহীনতা। এ প্রবচনটির পেছনে যে জনশ্রুতি প্রচলিত তাহলো কোনো এক কেরানিকে কিছু নথি নকল করার নির্দেশ দেয়া হলে ঐ ব্যক্তি মূল নথিতে একটি মৃত মাছি দেখতে পেয়ে একটি জ্যান্ত মাছি মেরে নকল করা কাগজের নির্ধারিত স্থানে সেটি জুড়ে দেয়। বিচার বুদ্ধি অন্ধ অনুকরণের এ দৃষ্টান্তই মাছিমারা কেরানি প্রবচনটির জন্ম-উৎস। প্রবচনের কেরানি মাছি বধ করলেও, মাছি মারা কিন্তু সহজ কাজ নয়। লেখক জানাচ্ছেন যে, মাছির মাথার চারদিকে চক্রাকারে অসংখ্য চোখ থাকে বলে মাছি একই সময়ে সবদিক দেখতে পায়। ফলে সামনে বা পিছনে যেদিক থেকেই মাছিকে আক্রমণ করা হোক না কেন, পূর্বেই দেখে ফেলে বলে মাছিকে মারা খুবই কঠিন কাজ। মানুষ দুই চক্ষুবিশিষ্ট প্রাণী-মাছির মতো একসঙ্গে সে সবদিক দেখতে পায় না। মাছির তুলনায় মানুষের এ দীনতা কিন্তু প্রকৃত অর্থে দীনতা নয়। কারণ মাছি বহুচোখের অধিকারী হলেও সে হৃদয় বা মন শূন্য। পক্ষান্তরে মানুষ দুচক্ষুবিশিষ্ট হলেও মানুষের রয়েছে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মনশ্চক্ষু।

প্রশ্ন : ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থসমূহে বইয়ের গুরুত্ব কীভাবে নির্দেশ করা হয়েছে?

উত্তর : হজরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে বাণী শুনতে পেয়েছিলেন, যা পবিত্র আল-কুরআন-এর প্রথমেই লিপিবদ্ধ আছে, তাহলো – ‘আল্লামা বিল কালাম’ আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন ‘কলমের’ মাধ্যমে। কলমের আশ্রয় গ্রহণ। এ হিসেবে পবিত্র আল-কুরআনে গ্রন্থের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেল-এর অর্থ বই, Per Excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক 'The Book'। খ্রিস্ট ধর্মেও তাই গ্রন্থের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু ধর্মে সর্ব পূজার গুরুতে বিঘ্ন সংহারক রূপে যে দেবতার পূজা করা হয়, সেই দেবতা গণপতি বা গণেশ বৃহত্তম গ্রন্থ লেখার গুরুতবে নিজের স্বন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। ‘গণ’ অর্থ জনগণ, আর জনগণের দেবতাই গণপতি। কাজেই জনগণ যদি গ্রন্থের সম্মান না করতে শেখে, তাহলে দেশভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

- “হায়, আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবাল, বিস্তৃত এ সুন্দরী ধরণীর সম্পর্গ সৌন্দর্য একসঙ্গেই দেখতে পেতুম।”
- “... নানা জ্ঞান বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।”
- পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।
- “সংসারে জ্বালা যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেয়া”
- রগটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা— যদি তেমন বই হয়।
- কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না।

ব্যখ্যার নমুনা উত্তর

“সংসারে জ্বালা যন্মা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেয়া”

উদ্ধৃতিটি সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘বই কেনা’ নামক রচনা থেকে চয়ন করা হয়েছে। উক্তিটি দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেলের।

মাছির মাথার চারদিকে চক্রাকারে অসংখ্য চোখ সাজানো থাকলেও মানুষের মতো তার মনের চোখ নেই। মানুষ তার মনের চোখকে সংকুচিত-প্রসারিত করতে পারে। দেশ বিদেশের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে মানুষ মনের চোখের প্রসারণ ঘটাতে পারে। পৃথিবীর অন্য সব সভ্য জাতি যতোই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, বাঙালি ততোই নিজের সীমাবদ্ধ জগতে আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে। বাঙালি অনায়াসে বই পড়ে এবং বই কেনার প্রবৃত্তি অর্জন করে চোখকে প্রসারিত করার শক্তি অর্জন করতে পারে। মনের চোখ ফোটানোর আবশ্যিকতা ব্যাখ্যায় দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল-এর বক্তব্যটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাসেল মনে করেন সামাজিক জীবন হিসেবে মানুষকে অনেক দুখ-কষ্ট সহিতে হয় বলে এর থেকে পরিত্রাণের পথও তাকে সন্ধান করতে হয়। তিনি মনে করেন জীবনযন্মাণাকে এড়িয়ে চলার প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভিতর স্বকীয় ভুবন বা জগৎ সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদ কালে তার মধ্যে ডুব দেয়া। মনশ্চক্ষুর অধিকারী মানুষের সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের কথা রাসেলের এ বক্তব্যের মাধ্যমে সমর্থিত হয়েছে।

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা – যদি তেমন বই হয়।

উদ্ধৃত বাক্যটি সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘বই কেনা’ রচনার অন্তর্গত। এ অংশে কবি ওমর খৈয়াম-এর একটি রুবাই-এর অনুসরণে লেখক প্রকৃত গ্রন্থের চিরায়ত মূল্য সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম স্বরচিত একটি রুবাই-এ কাঙ্ক্ষিত স্বর্গের উপকরণের তালিকায় রুটি, মদিরা এবং প্রিয়ার সঙ্গে পদ্যগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গ্রন্থের সাহচর্যে স্বর্গবাসও যে মোহনীয় হয়ে উঠতে পারে ওমর-এর কবিতায় সে সত্যই প্রকাশিত। বর্তমান নিবন্ধের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী কবিতাটির বিষয়বস্তু নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ওমর এর কাঙ্ক্ষিত স্বর্গে একসময় রুটি ও মদ ফুটিয়ে যাবে, মদের প্রতিক্রিয়ায় প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইটি থেকে যাবে অনন্তযৌবনা – ‘যদি তেমন বই হয়’। একটি মহৎ গ্রন্থে প্রচ্ছন্ন থাকে অপার সম্ভাবনা। প্রতিবার পাঠে একটি মহৎ গ্রন্থ নতুন-নতুন তাৎপর্য নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়। এজন্যই কালজয়ী গ্রন্থের আবেদন নিঃশেষ হয় না। লেখক তাই যথার্থভাবেই গ্রন্থকে অনন্তযৌবনা বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্বের ‘বই কেনা’ প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত বাক্যটি নেয়া হয়েছে। এতে বই কেনার ব্যাপারে বাঙালির স্বভাব কৃপণতা নিয়ে তীব্র বিদ্রূপ করেছেন লেখক।

ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থসমূহে পুস্তকের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র গ্রন্থ আল্ কুরআন এর শুরুতেই আল্লাহ যে মানুষকে ‘কলম এর মাধ্যমে জ্ঞান দান করেছেন, তার উল্লেখ আছে। বাইবেল শব্দের অর্থও বই। হিন্দুদের সনাতন ধর্মে যে দেবতাকে সকল বিপদের ত্রাতারূপে স্মরণ করা হয়, সেই দেবতা গণপতি বা গণেশ বৃহত্তম গ্রন্থ লেখার গুরুত্ব স্বৈচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ধর্মের দৃষ্টান্ত বই কেনার ব্যাপারে স্বভাব কৃপণ বাঙালিকে উদ্ভুদ্ধ করে না। সৈয়দ মুজতবা আলী বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত প্রবচন ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ কে পরিবর্তন করে বাঙালির উদ্দেশ্যে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বাণ নিষ্ক্ষেপ করেছেন। বাঙালি বই কেনার প্রসঙ্গ আসলেই ধর্মের দৃষ্টান্তকে এড়িয়ে চলে, অজুহাত তোলে কাঁচা টাকার অভাবের। লেখকের মতে এ মনোভাবের পশ্চাতে যে সত্য প্রচ্ছন্ন তা নিতান্তই তুচ্ছ; কড়ে আঙুল পরিমাণ।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ◆ বাঙালি পাঠক ও প্রকাশকের মনোভাব ব্যাখ্যা করে লিখতে পারবেন।
- ◆ লেখকের অনুসরণে বই কেনার উপযোগিতা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
প্রকাশক – গ্রন্থ প্রকাশ করেন যে ব্যবসায়ী।	বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশি বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, ‘বইয়ের দাম কমাও’ তবে সে বলে, “বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে।”
আনা – $\frac{১}{১৬}$ টাকা।	“কেন মশাই, সংখ্যার দিক দেখতে গেলে বাংলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এ ধরুন, ফরাসি ভাষা। এ ভাষায় বাংলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচসিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?”
পাঁচসিকে – ১টাকা ৪ আনা।	“আজ্ঞে, ফরাসি প্রকাশক নির্ভয়ে যে কোন ভাল বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস উঠে দুজাহার ছাপাতে গেলেই। বেশি বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?”
নাভিশ্বাস – মুমূর্ষু অবস্থায় উর্ধ্বমুখী শ্বাসের টান।	তাই এ অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।
দেউলে – নিঃশ্ব, কপর্দকশূন্য।	এ চক্র ছিন্লে তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ।
চক্র – কর্মবিপাক, ঘটনার ফের।	এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ—দেউলে হবার ভয়ে। কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত, অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।
এক্সপেরিমেন্ট – পরীক্ষা, experiment।	ভেবে- চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁতমুখ খিচিয়ে তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে এবং সর্বশেষে সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যখানে। এ একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা, যার দরুন সকাল বেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতি দেখতে হয়না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।
নারাজ – অসম্মত।	আমি নিজে কি করি? আমি একাধারে Producer এবং Consumer। তামাকের মিকচার দিয়ে আমি নিজেই সিগারেট বানিয়ে Producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই Consumer; আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই Produce করেছি। কেউ কেনে না বলে আমিই Consumer; অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।
বাজেট – অর্থ সংস্থান ও ব্যয় পরিকল্পনা, budget.	
অগ্রপশ্চাৎ – আগ-পাছ, পূর্বপর।	
সংসারী – হিসেবী অর্থে।	
পাঁড় পাঠক – সাহিত্যরসে অতিশয় আসক্ত পাঠক।	
খিচিয়ে – ভেংচিয়ে, মুখ বিকৃত করে।	
ক্ষ্যাপা – উন্মাদ।	
চুর হয়ে থাকা – বৃন্দ হয়ে থাকা।	
ব্যসন – নেশা।	
লিভার – যকৃৎ।	
পটল তোলা – মারা যাওয়া।	
Producer – উৎপাদক।	
তামাকের মিকচার – তৈরি করা	

সার-সংক্ষেপ

বইয়ের দাম কম হলে অধিক সংখ্যক বই বিক্রি হবে নিশ্চয়। কিন্তু বাঙালি প্রকাশকের পক্ষে বইয়ের দাম কমানো ঝুঁকিপূর্ণ। পাঠক যদি অধিক সংখ্যক বই ক্রয় করে তাহলে প্রকাশনার জগতে সংকট থাকে না। কিন্তু বই কেনার ক্ষেত্রে বাঙালির রয়েছে স্বভাবগত অনীহা।

পাঠক প্রকাশকের এ চক্র ছিন্ন করা প্রয়োজন। কিন্তু কে করবে এ কাজ? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন কেননা এর সঙ্গে তার রুটি-রুজির তথা অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। দেউলে হওয়ার আশঙ্কায় ঝুঁকি নিতে সে নারাজ। কাজেই এ ক্ষেত্রে পাঠককেই এগিয়ে আসতে হবে। কেননা বই কিনে কেউ কখনো দেউলে হয়নি।

হিসেবি লোক ভেবেচিন্তে বই কেনে। সাহিত্য রসে নিমজ্জিত পাঠক প্রথমে বই কেনে দাঁতমুখ খিচিয়ে, এবং শেষে বেহিসেবির মতো।

পাঠকের মূল্যায়ন



নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বইয়ের দাম না কমানোর পক্ষে প্রকাশকের যুক্তি ব্যাখ্যা করুন।
২. বই না কেনার পক্ষে বাঙালি পাঠকের অজুহাত ব্যাখ্যা করুন।
৩. ক্রেতা-সমস্যা এবং প্রকাশনার সংকট নিরসনে লেখকের অভিনব উদ্যোগের পরিচয় দিন।

প্রশ্ন : ক্রেতা-সমস্যা এবং প্রকাশনার সংকট নিরসনে লেখকের অভিনব উদ্যোগের পরিচয় দিন।

উত্তর : বইয়ের দাম কম থাকলে অধিক সংখ্যক বই বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার বেশি সংখ্যক বই বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কম রাখা সম্ভব হয় না। পাঠক এবং প্রকাশক দুই তরফের দিক থেকেই বিষয়টি সমস্যার। লেখকের বিশ্বাস বই কিনে মানুষ কখনো দেউলে হয় না। প্রকাশনার সঙ্গে রুটি-রুজির প্রশ্ন জড়িত থাকায় প্রকাশকের পক্ষে যা ঝুঁকি, পাঠকের পক্ষে তা নিতান্তই সামান্য ব্যাপার। লেখক উপর্যুক্ত সমস্যা নিরসনে এক কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি একাধারে গ্রন্থ প্রকাশ করে Producer হয়েছেন, আবার গ্রন্থটির কাটতি কম হওয়ায় মাঝে মাঝেই Consumer সেজে বইটি কিনে এনেছেন। লেখকের এ কৌতুকের মধ্যে কিন্তু প্রচ্ছন্ন রয়েছে তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রোপ। বাঙালি পাঠকের গ্রন্থ ক্রয়ে অনীহার কারণেই কখনো কখনো লেখককে নিজের এ কেনার বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। এ ঘটনাটির উল্লেখ করে লেখক বাঙালি মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোপবাণ নিক্ষেপ করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।
২. কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি।
৩. মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মতো, অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মতো এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

৪. এ একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা, যার দরুন সকাল বেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মতো, অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মতো এক গাদা নতুন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

আলোচ্য বাক্য সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব গ্রন্থের ‘বই কেনা’ প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বাক্যটিতে ‘বই কেনা’ প্রসঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে।

বইয়ের দাম বেশি বলে বাঙালি পাঠক বই কিনতে নারাজ, অন্যদিকে পাঠক বই কেনে না বলে বাঙালি প্রকাশক বইয়ের দাম কমাতে অপারগ। ব্যবসায়ী প্রকাশকের পক্ষে আর্থিক কারণে বইয়ের দাম কমানো ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু একটি বই কেনা পাঠকের জন্য নিতান্ত সামান্য ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে বাঙালির রয়েছে বই কেনায় স্বভাব-অনিচ্ছা। অথচ বই কিনে কেউ কপর্দকশূন্য বা দেউলে হয় না কখনো। পক্ষান্তরে প্রচুর বই কিনে চেতনাগতভাবে সে সমৃদ্ধ হতে পারে। জ্ঞানের ঐশ্বর্যে, দৃষ্টিভঙ্গির বিশালতায় সে হতে পারে বিশিষ্ট। বইকেনার বাজেট তিনগুণ বাড়িয়ে একজন পাঠক তার মনের চোখকে প্রসারিত করতে পারে, পারে আনাতোল ফ্রাস কথিত মাছির মতো অনেকগুলি চোখের অধিকারী হতে; সৃষ্টি করতে পারে বারট্রাভ রাসেল কথিত অসংখ্য আত্মত ভুবন।

এ একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা, যার দরুন সকাল বেলা চোখের সামনে সারে সারে গোলাপী হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ মুজতবা আলী লিখিত পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব গ্রন্থের ‘বই কেনা’ প্রবন্ধের অন্তর্গত। লেখক গ্রন্থপাগল ক্রেতার বেহিসেবি বই কেনার ইতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

বই কেনে কেউ কখনো দেউলে হয় না। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিশেষত মদ্যসজ্জদের মধ্যে ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নেশাগ্রস্ত হয়ে মদ্যপের চোখে বস্তুজগৎ বিকৃত রূপে ধরা দেয়, যকৃৎের রোগে আক্রান্ত হয়ে তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। কিন্তু গ্রন্থসজ্জের পক্ষে এ-রকম কোনো আশঙ্কার অবকাশ নেই। তার আসক্তি তাকে আবদ্ধ করে না, জ্ঞানের বহুত্তর জগতে তার প্রবেশাধিকারকে বাধামুক্ত করে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ◆ দুনিয়ার মানুষ কীভাবে লাইব্রেরী গড়ে তোলে তা বলতে পারবেন।
- ◆ লেখকের অনুসরণে জ্ঞানী ও ধনীরা পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ বই কেনার ক্ষেত্রে বাঙালি মানসিকতা এবং বই সম্পর্কে বাঙালি দম্পতির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মার্ক টুয়েন – জন্ম ১৮৩৫, মৃত্যু ১৯২০। প্রকৃত নাম স্যামুয়েল এল. ফ্রেমেনস। ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ টম সয়ের, হকেলবেরি ফিন্।	মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মতো ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের ওপরও গাদা গাদা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত— পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক টুয়েনকে বললেন, “বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটাকয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?” মার্ক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, “ভাই, বলেছেন


<p>কার্পেট – গালিচা । স্তূপীকৃত – রাশীকৃত । শেলফ – বইয়ের তাক । লাইব্রেরি – গ্রন্থাগার । বিবেক বর্জিত – বিবেকশূন্য । কামানো – রোজগার করা । বিচক্ষণ – জ্ঞানী, সুবিবেচক । চক্ষুগোচর – দৃষ্টিসীমার অন্তর্ভুক্ত । পক্ষান্তরে – অপরপক্ষে । কিউ.ই.ডি. Q.E.D.– quod erat demonstrandum যা দেখানো হবে/প্রমাণিত হবে । মহত্তর – অধিকতর মহৎ । অকাতরে – খেদ না করে, বিনা দুঃখে । ড্রইংরুম বিহারিনী – বিভিন্ন বাড়ির বৈঠকখানায় বিচরণ করে বেড়ান যে নারী । সওগাত – উপহার । গরবিনী – গর্বিতা । ধনী – বিত্তশালিনী এবং যুবতী এ দু'অর্থে লেখক শব্দটি প্রয়োগ করেছেন । ওঁর – উনার (সংক্ষিপ্ত রূপে সম্মানার্থে “ ’ ব্যবহৃত হয়েছে ।</p>	<p>ঠিকই– কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না ।” শুধু মার্ক টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকেই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে । যে মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকেই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক- বিবর্জিত । তার কারণটা কি? এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম । পণ্ডিত লিখেছেন, “ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কর্ম । কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন– না, জ্ঞানার্জন সবচেয়ে শক্ত কাজ । এখন প্রশ্ন কার দাবিটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন । তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করতে চাই । ধনীর মেহনতের ফল হল টাকা । সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, চের উত্তম পদ্ধতিতে । পক্ষান্তরে, জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে পায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না–বই পড়তে পারে না ।” আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ.ই.ডি. দিয়ে ‘অতএব সপ্রমাণ হলো জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর ।’ সেদিন তাই শোক প্রকাশ করতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন । এক ড্রইংরুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে । দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়, এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিনী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না । সব কিছু তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে । শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, “তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?” গরবিনী নাসিকা কুণ্ঠিত করে বললেন, “সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে ।” যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী । একখানা বই-ই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট ।</p>
--	--

সার-সংক্ষেপ

বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করা বই ফেরৎ না দিয়ে ঔপন্যাসিক মার্ক টুয়েন গড়ে তুলেছিলেন বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার । শুধু মার্ক টুয়েনই নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে এবং কিছু ধার করা বই ফেরৎ না দিয়ে । যে ব্যক্তি প্রথর নীতিবোধ সম্পন্ন, তার কাছেও পরের বই দিয়ে গ্রন্থাগার সাজানোর ব্যাপারটি অপরাধ বলে গণ্য হয় না । গলা কেটে ফেললেও যে ব্যক্তি পরের জিনিস স্পর্শ করে না, সে লোকই রহস্যজনকভাবে বইয়ের ক্ষেত্রে বিবেকশূন্য! এ রহস্যের সমাধান পাওয়া যায় এক আরব পণ্ডিতের লেখায় । তিনি দুই বিত্তশালী ও জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে ধনী প্রচুর অর্থ আয় করে যদি জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয় তবে জ্ঞানী ব্যক্তিটি পরমানন্দে মহৎ কাজে ব্যয় করতে পারেন । অপরপক্ষে জ্ঞানীর জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে যে পুস্তকগুলোয় সেগুলি ধনীর হাতে তুলে দিলেও তার পক্ষে সেগুলির যথার্থ ব্যবহার সম্ভব হয় না । আরব পণ্ডিত তাই এ সিদ্ধান্ত পৌঁছান যে জ্ঞানার্জনের পথ ধনার্জনের চেয়ে অধিকতর মহৎ । এজন্যেই, কেবল বাংলাদেশ ছাড়া সকল দেশের প্রকৃত মানুষ বই সংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে । প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী এক বাঙালি নগরবাসিনীর কৌতুকপ্রদ দৃষ্টান্ত দিয়ে বাঙালির গ্রন্থবিমুখতার স্বরূপটি চিহ্নিত করেছেন । অফুরন্ত অবসর যাপন করে বিভিন্ন বৈঠকখানায় বিচরণ করে বেড়ান যে

মহিলা, তিনি তার স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে উপহার সামগ্রী কেনার জন্য দোকানে যান। কিন্তু সবকিছুই নিজের সংগ্রহে থাকার কারণে তার পক্ষে কিছুই কেনা হয় না। দোকানি এটা-ওটা দেখিয়ে গলদকর্ম হয়ে শেষ অবধি একটি বই কেনার প্রস্তাব রাখে। কিন্তু গর্বিতা ও ধনাঢ্য এ যুবতী নাক সিটকে জবাব দেন যে, এ রকম একটা জিনিস তার স্বামীর সংগ্রহে রয়েছে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই একটি বই সংগ্রহে থাকার গর্বে কীভাবে নির্বোধের মতো তৃপ্তি অনুভব করতে পারে- এ কাহিনী উপস্থাপন করে লেখক গ্রন্থবিমুখ বাঙালি সমাজের ভেতরের রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।
---	--

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঔপন্যাসিক মার্ক টুয়েন কীভাবে লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন?
২. বই সংগ্রহের ব্যাপারে মানুষ বিবেক বর্জিত হয় কেন? এ ব্যাপারে আরব পণ্ডিত কী মনে করেন?
৩. পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ লাইব্রেরি গড়ে তোলে কীভাবে?
৪. বইয়ের ব্যাপারে 'ড্রইংরুম বিহারিনী' বাঙালি নারীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।


প্রশ্ন : বই সংগ্রহের ব্যাপারে মানুষ বিবেক বর্জিত হয় কেন? এ ব্যাপারে আরব পণ্ডিত কী মনে করেন?

উত্তর : পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই গ্রন্থাগার গড়ে তোলে কিছু বই কেনে এবং কিছু ধার করা বই ফেরৎ না দিয়ে। যে ব্যক্তির জীবন প্রথর নীতিবোধ দ্বারা চালিত, তাঁর কাছেও পরের বই দিয়ে গ্রন্থাগার সাজানোর ব্যাপারটি বিবেকবর্জিত বিষয় বলে গণ্য হয় না। কেননা পরের এ সংগ্রহ করে ধন অর্জিত হয় না, অর্জিত হয় জ্ঞান। আর জ্ঞান আহরণের মধ্যে নেই কোনো অপরাধ। আরব-পণ্ডিত ধনী ও জ্ঞানীর মধ্যে তুলনা বিচার করে বিষয়টির গ্রহণযোগ্য মীমাংসা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন ধনীর আয় করা প্রভূত অর্থ সংকাজে ব্যয় করার সামর্থ্য রাখেন জ্ঞানী ব্যক্তি। অপরপক্ষে জ্ঞানীর জ্ঞানসাধনার ফল সঞ্চিত থাকে যে সব পুস্তকে, সেগুলি ধনীর হাতে জোর করে তুলে দিলেও ধনী ব্যক্তির পক্ষে সেগুলির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না। আরব পণ্ডিত তাই মনে করেন যে 'জ্ঞানার্জন' ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর'।

প্রশ্ন : বইয়ের ব্যাপারে 'ড্রইংরুম বিহারিনী' বাঙালি নারীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন।

উত্তর : বাঙালির গ্রন্থবিমুখতার ও অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত হিসেবে লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী এক নগরবাসিনীর কৌতুককর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। অফুরন্ত অবসর যাপন করে শহরের বিভিন্ন বৈঠকখানায় বিচরণ করেন ঐ মহিলা। তিনি তার স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে কিছু উপহার কেনার জন্য দোকানে যান। দোকানের কোনো কিছুই তার পছন্দ হয় না। তার ড্রইংরুমে সাজানো আছে সবকিছুই। দোকানি এটা ওটা দেখিয়ে গলদঘর্ম হয়ে অবশেষে একটি বই কেনার প্রস্তাব রাখে মহিলাটির কাছে। এ প্রস্তাবের উত্তরে ধনাঢ্য ও গর্বিতা এ যুবতী নাক সিটকে জবাব দেন, এ-রকম একটা জিনিসও তার স্বামীর সংগ্রহে রয়েছে। অন্যান্য প্রদর্শন যোগ্য বস্তুর মতোই যে একটি বইয়ের মূল্য এবং একটি মাত্র বই সংগ্রহে থাকলেই যে গ্রন্থ জাতীয় বস্তু সংগ্রহের দৃষ্টান্তটি পূর্ণ হয়ে যায় – এ রকম স্কুল এবং মেধাবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি মহিলাটির সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।
---	---

১. দুনিয়ার অধিকাংশ লোকেই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, আর কিছু বই বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরৎ না দিয়ে।

২. যে মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকেই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক বিবর্জিত।
৩. ‘অতএব সপ্রমাণ হলো জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর’।
৪. প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া।
৫. যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট।

‘অতএব সপ্রমাণ হলো জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর’।

উদ্ধৃত বাক্যটি সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব গ্রন্থের ‘বই কেনা’ প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এ অংশে বই সংগ্রহের ব্যাপারে মানুষের বিবেকবর্জিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যায় এক আরব পণ্ডিতের মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি কঠিন নীতির শাসন দ্বারা চালিত হয় সে ব্যক্তিত্ব অন্যের কাছ থেকে ধার করা বই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। কঠোর নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিও বই সংগ্রহের ঐ পদ্ধতিকে বিবেকবর্জিত ব্যাপার বলে মনে করেন না। এক আরব পণ্ডিতের দেয়া ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে লেখক ব্যাপারটির কারণ সন্ধান করেছেন। আরব-পণ্ডিত দুই বিভবান ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রসঙ্গে ধরে দেখিয়েছেন যে, ধনী ব্যক্তি প্রচুর অর্থ যদি জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয় তবে জ্ঞানী ব্যক্তিটি মহানন্দে তা সং-উদ্দেশ্যের ব্যয় করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে জ্ঞানীর জ্ঞানসাধনার ফল সঞ্চিত থাকে যে সব পুস্তকে সেগুলি ধনীর হাতে জোর করে তুলে দিলেও ধনী ব্যক্তিটির পক্ষে উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয় না। এ দৃষ্টান্ত থেকেই আরব পণ্ডিত এ-রকম সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, জ্ঞানার্জন ধন অর্জনের চেয়ে অধিকতর মহৎ কাজ।

প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া।

আলোচ্য অংশ রম্যসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্বের ‘বই কেনা’ প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে বাংলার মানুষের গ্রন্থবিমুখতার কথা উল্লেখ করেছেন লেখক।

জ্ঞানের বাহন পুস্তক। পৃথিবীব্যাপী প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক সংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে ধার করা বই পর্যন্ত ফেরৎ দেয় না। কিন্তু বাঙালি স্বভাবতই গ্রন্থবিমুখ। গ্রন্থ ক্রয় করে অর্থ ব্যয় করাকে অপব্যয় বিবেচনা করে বাঙালি। বাঙালিরা অনাবশ্যক খাতে অর্থ খরচ করে। কিন্তু গ্রন্থ ক্রয় করা যে খরচ নয়, সঞ্চয় তা তারা ভেবে দেখে না। পৃথিবীর প্রকৃত মানুষের তুলনায় বাঙালি মানসের এ দীনতা পীড়িত করেছে লেখককে।

বাংলাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্রই গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য মানুষ অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু গ্রন্থ বিমুখতা বাঙালির স্বভাবের অংশ।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ◆ ফরাসিরা গ্রন্থের প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ বন্ধু-লেখকদের বিরুদ্ধে আঁদ্রে জিদের প্রতিশোধ নেয়ার কাহিনীটি লিখতে পারবেন।
- ◆ জ্ঞানতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও বই কেনার ব্যাপারে বাঙালির অনীহার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

মূলপাঠ

মোক্ষম – নির্ঘাত ।	অথচ এ বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স । কাউকে মোক্ষম মারাম্ম অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে । মনে করুন, আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য । তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জত করতে চায়, তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে । নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চগশগুণ নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে ।
মাম্বক – সাজ্বাতিক ।	আঁদ্রে জিদের মেলা বন্ধু-বান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নামকরা লেখক । জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন ।
ডাহা – সম্পর্গ ।	প্যারিসে স্তালিনীয়রা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুবাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল । কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ করে সবকিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না । জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে ।
বেইজ্জত – অপদস্থ, অপমানিত ।	কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল, জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন । প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মুচ্ছা গেল । কিন্তু সম্বিত ফেরা মাত্রই মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে ।
দংশন – কামড়ান ।	সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষুস্থির ।
আঁদ্রে জিদ – জন্ম ১৮৬৯, মৃত্যু ১৯৫১ । ফরাসি ঔপন্যাসিক । ১৯৪৭-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন । শ্রেষ্ঠ রচনা-টেসে (১৯৪৬), লা পোট্টে (১৯০৯), সোল (১৮৯৫) ।	যেসব লেখক জিদের হয়ে লড়েননি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষরসহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন । জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন ।
প্রাণঘাতী – মৃত্যু ঘটায় এমন ।	প্যারিসের লোক তখন যে অউহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিলেন ।
কেতাব – গ্রন্থ ।	অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়িঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা জানতে পারে ততই মঙ্গল । (বাংলাদেশে নাকি একবার এ রকম টিকিট বিক্রি হয়েছিল) ।
প্যারিস – ফ্রান্সের রাজধানী ।	শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেননি ।
স্তালিনীয়রা – জে.ভি. স্ট্যালিন-এর (১৮৭৯-১৯৫৩) অনুসারীবৃন্দ । ১৯২৪ সনে লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন বলশেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন । মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর হাতে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন সোভিয়েত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন ।	আর কত বলবো? বাঙালির কি চেতনা হবে?
কটুকাটব্য – কড়া কথা, গালমন্দ ।	তাও বুঝতুম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকত, আমার বেদনাটা সেইখানে ।
জিগরে – কলিজায়, যকৃতে ।	বাঙালি যদি হটেনটেট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না । এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি । জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা । আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, ‘বাঙালির পয়সার অভাব ।’ বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা?ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না, সিনেমার টিকিট কাটার ‘কিউ’ থেকে?
মূচ্ছা – অচেতন্য, অজ্ঞান অবস্থা ।	থাঙ্ থাঙ্ । আমাকে খামাখা চটাবেন না । বৃষ্টির দিন । খোশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম । তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি । গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি । আরব্যোপন্যাসের গল্প ।
সম্বিত – জ্ঞান, হুঁশ ।	এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন । বই হস্তগত হলো । রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন । কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে
মুক্তকচ্ছ – কাছাকাছা ।	
চক্ষুস্থির – বিস্ময়জনিত হতবুদ্ধিতা ।	
জঞ্জাল – আবর্জনা ।	
ভূমধ্যসাগর – ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত সাগরবিশেষ ।	
রয়টার – বার্তা সংস্থা ।	
সাড়ম্বরে – আড়ম্বরসহ ।	
টিকি – ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ হিন্দুগণ কর্তৃক মস্তকের মধ্যভাগে সংরক্ষিত কেশগুচ্ছ ।	
হটেনটেট – আফ্রিকার	

নির্বোধশ্রেণীর উপজাতি।	জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাথিয়ে রেখেছিলেন মারাম্ব বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।
ভূ-ভারত – পৃথিবী ও ভারতবর্ষ, সমস্ত পৃথিবী।	রাজাকে এ প্রতিহিংসার খবরটিও রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।
অবলা – বলহীনা; বাকশক্তিহীন।	বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।
কিউ – অপেক্ষমান মানুষের সারি Queue।	
গূঢ়ার্থ – মর্মার্থ, অপ্রকাশিত অর্থ, গুপ্ত অর্থ।	
হেকিম – ইউনানি চিকিৎসক।	
বাহ্যজ্ঞান – ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞান, চেতনা।	
বিষবাণ – বিষ রূপ বাণ।	
বৈরাগ্য – অনাসক্তি, উদাসীনতা।	

সার-সংক্ষেপ

বইকে প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফরাসিরা। কাউকে অপমান করতে হলেও তারা বইয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদ রাশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্যারিস শহরে যোশেফ স্ট্যালিন-এর অনুসারী যারা ছিলেন তারা জিদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তাঁর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। জিদ-এর বন্ধু বান্ধবদের অধিকাংশই ছিলেন ফ্রান্সের নামকরা লেখক। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এক্ষেত্রে নীরবতা পালন করলেন তাঁরা; জিদের পক্ষ হয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন না। অপমানিত জিদ স্থির করলেন এর উচিত প্রতিশোধ তিনি নেবেন। কিছুদিন পরেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরলো আঁদ্রে জিদ তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বিক্রি করে দিতে মনস্থির করেছেন। জিদ জঞ্জাল সাফ করার জন্য সেই সব বইই নিলামে উঠিয়েছিলেন, যে বইগুলি তিনি উপহার পেয়েছিলেন সেই সব বন্ধুদের কাছ থেকে যারা তাঁর পক্ষ হয়ে লড়েন নি। অপমানিত লেখকরা তখন তড়িঘড়ি লোক পাঠিয়ে তাঁদের উপহার দেয়া বইগুলি দ্বিগুণ দামে কিনিয়ে নিয়েছিলেন।

বাঙালি আফ্রিকার আদিবাসী অসভ্য কোনো জনগোষ্ঠী নয়। অথচ বাঙালির মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত এক স্ববিরোধিতা। এরা জ্ঞানের জন্য তৃষিত অথচ প্রবলভাবে গ্রন্থবিমুখ! বই কেনার কথা বললেই বাঙালির মুখে রা সরে না। অন্যভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু বই কেনার প্রসঙ্গ আসলেই তার পকেট ফাঁকা। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তীব্র বিদ্বেষ করে লিখেছেন যে, বাঙালির বইয়ের প্রতি উদাসীনতা দেখে মনে হয়, বাঙালি আরব্য উপন্যাসের রাজা ও হেকিমের গল্পটি জানে। আর জানে বলেই মরার ভয়ে বই কেনা ও পড়া ছেড়ে দিয়েছে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন



নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ফরাসিদের গ্রন্থপ্রীতির পরিচয় দিন।
- আঁদ্রে জিদ কর্তৃক নিলামে লাইব্রেরি বিক্রি করে দেয়ার কী উদ্দেশ্য ছিলো?
- আঁদ্রে জিদ বন্ধু লেখকদের বিরুদ্ধে কোন উপায়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন?
- নিজের বন্ধুরা অপমান এড়ানোর জন্য কোন উপায় অবলম্বন করেছিলেন?
- “এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি” লেখক কথাটি বলেছেন কোন্ প্রসঙ্গে?

৬. রাজা ও হেকিমের গল্পের তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : আঁদ্রে জিদ কর্তৃক নিলামে লাইব্রেরি বিক্রি করে দেয়ার কী উদ্দেশ্য ছিলো?

উত্তর : ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদ তাঁর লেখক বন্ধুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার নিলামে বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফরাসিরা গ্রন্থকে প্রকৃত সম্মান করতে জানে। কাউকে অপমান করতে হলেও তারা বইকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। জিদও অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য গ্রন্থকেই বেছে নিয়েছিলেন।

আঁদ্রে জিদ রাশিয়া থেকে ফিরে সোভিয়েট প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্যারিস শহরে স্ট্যালিন-এর অনুসারীবৃন্দ যারা ছিলেন তারা গালিগালাজ করে জিদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। জিদের এ-দুঃসময়ে তাঁর ফরাসি লেখকবন্ধুরা আশ্চর্য নীরবতা পালন করলেন। তাঁদের কেউ জিদ-এর পক্ষ হয়ে কথা বললেন না। অন্তরে ঘা খেলেন জিদ; তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন এর উপযুক্ত প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। এরই সূত্র ধরে সমগ্র ফ্রান্সকে হতচকিত করে তিনি নিজের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বিক্রির বিজ্ঞাপন প্রচার করলেন। দলে দলে ফরাসিরা ছুটে এলো নিলামখানায়। কিন্তু নিলামখানার অবস্থা দেখে তাদের চক্ষুস্থির। জিদ নিলামে উঠিয়েছেন সেইসব গ্রন্থ যেগুলিকে তাঁকে তাঁর ফরাসি লেখকবন্ধুরা উপহার দিয়েছিলেন। জিদ-এর মনোভাব যেন এ রকম যে, তিনি তাঁর গ্রন্থাগার-এর আবর্জনা সাফ করতে মনস্থ করেছেন। অপমানিত লেখকবন্ধুরা বড় ধরনের অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে দ্রুত বইগুলি কিনে ফেললেন। এতে অবশ্য জিদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি বিন্দুমাত্র।

প্রশ্ন : “এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি” লেখক কথটি বলেছেন কোন্ প্রসঙ্গে?

উত্তর : বই কেনার ব্যাপারে বাঙালির স্বভাব-অনীহা প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্যটি করেছেন। বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু এ-তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যম যে বই, তা কেনার ক্ষেত্রে বাঙালি আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন। লেখকের বেদনার কারণ এজন্য যে, বাঙালি আফ্রিকার আদিবাসী অসভ্য কোনো জনগোষ্ঠী নয়, তার রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। অথচ জ্ঞানতৃষ্ণা ও গ্রন্থবিমুখতা এ দুই পরস্পরবিরোধী মানসিকতা বাঙালি লালন করে তার চেতনায়। বাঙালির জাতিগত চৈতন্যে এ দুই বিরোধী চেতনার অদ্ভুত সংমিশ্রণ পৃথিবীর আর কোনো জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেননি লেখক।

প্রশ্ন : রাজা ও হেকিমের গল্পের তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু গ্রন্থ কেনায় বাঙালি উৎসাহ বোধ করে না। খেলার মাঠের সামনে কিংবা সিনেমার টিকেট কাটার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বাঙালি নির্লজ্জের মতো অনায়াসে বলতে পারে “বাঙালির পয়সার অভাব”। বাঙালির মানসিকতার গুণ্ড অর্থ লেখক আরব্য উপন্যাসের একটি গল্পের তাৎপর্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন।

আরব্য উপন্যাসের ঐ গল্পের রাজা তাঁরা চিকিৎসকের একটি মূল্যবান গ্রন্থ বাগাতে না পেরে অবশেষে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হলে রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বই খানি পড়তে শুরু করেন। কিন্তু বইয়ের পাতাগুলি একটির সঙ্গে আরেকটি এমনভাবে জড়ানো ছিলো যে, রাজাকে থুথুর সাহায্যে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে হচ্ছিলো। হেকিম কিন্তু নিজের মৃত্যুর অমোঘতা সম্পর্কে পূর্বাঙ্কে নিশ্চিত হয়েই বইয়ের প্রতি পাতায় বিষ মাখিয়ে নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বইটির শেষ পাতায় তাঁর প্রতিহিংসার বিষয়টিও তিনি লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু রাজা যখন শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছিলেন এবং হেকিমের প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের উপায়টি পাঠ করলেন তার পরপরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বাঙালির বই কেনা ও পড়ার ব্যাপারে উদাসীনতার প্রসঙ্গ ঐ গল্প দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, বাঙালি পূর্বাঙ্কে এ গল্পটি পড়ে ফেলেছে বলেই, আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে যে বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। লেখকের এ বক্তব্যের অন্য একটি তাৎপর্যও রয়েছে। লেখক যেন বলতে চান বই পড়লে বাঙালির জ্ঞানজগৎ বিকশিত হবে আর বিকশিত হতে চায় না বলেই বাঙালি বই পড়ে না।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. অথচ এ বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে।
২. নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশগুণ নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।
৩. প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মুচ্ছা গেল। কিন্তু সম্মিত ফেরা মাত্রই মুক্তকণ্ঠ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।
৪. বাঙালি যদি হটেনটেট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না।
৫. জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা।
৬. বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে; আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশগুণ নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আলোচ্য অংশ রম্যসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব গ্রন্থের “বই কেনা” প্রবন্ধ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ অংশে ফরাসিদের দেশচেতনা সম্পর্কে লেখক আলোকপাত করেছেন।

ফরাসিরা বইয়ের সম্বাদার। তাঁরা প্রিয়জনকে যেমন বই উপহার দেয় তেমনি কাউকে অপমান করতে হলেও বইকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। আঁদ্রে জিদ তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মূলত ফরাসিদের দেশ ও জাতিসত্তার মর্মমূলেই আঘাত করেছিলেন। লেখক মনে করেন কারো বিরুদ্ধে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা জানাতে হলে সর্বোত্তম পন্থা হলো তার দেশকে অপমান করা। নিজের অপমান পঞ্চাশগুণ ভয়াবহ হলেও তা সহ্য করার শক্তি হয়ত থাকে, কিন্তু দেশের অপমান কোনো ব্যক্তিই সহজে মেনে নিতে পারে না। দেশের অপমান দংশনের বেদনা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের অন্তরে সক্রিয় থাকে। ফরাসিদের স্বদেশচেতনার দৃষ্টান্ত হিসেবেই লেখক আঁদ্রে জিদ-এর প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এবং সেই সূত্রে বইয়ের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি উন্মোচন করেছেন।


প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মুচ্ছা গেল। কিন্তু সম্মিত ফেরা মাত্রই মুক্তকণ্ঠ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।

ব্যাখ্যেয় বাক্য দুটি রম্যসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব গ্রন্থের রম্যপ্রবন্ধ ‘বই কেনা’ থেকে চয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য অংশে লেখক ফরাসি সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদের গ্রন্থাগার বিক্রয় করে দেয়ার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসিদের প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন সর্বোত্তম।

রাশিয়া থেকে ফিরে সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন আঁদ্রে জিদ। স্ট্যালিনের অনুসারীবৃন্দ যারা প্যারিসে অবস্থান করছিলেন তারা এ ঘটনার শোধ নিতে জিদের পেছনে লাগলেন। গালিগালাজ ও কটুকাটব্যে তারা অস্থির করে তুললেন জিদ-এর জীবন। জিদ আশা করেছিলেন তাঁর লেখক বন্ধুরা এর প্রতিবাদ করবেন; জিদ-এর হয়ে এ অন্যায়ে বিরুদ্ধে লড়বেন তাঁরা। কিন্তু তাঁর লেখক-বন্ধুরা কেউই জিদের পক্ষ

হয়ে দাঁড়ালেন না, পালন করলেন নীরব ভূমিকা। এতে আঁদ্রে জিদ ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হলেন। তিনি তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন। ফরাসিরা গ্রন্থপ্রেমিক, কাউকে অপমান করতে হলেও তারা বইকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। আঁদ্রে জিদ কিন্তু অপমানের শোধটি কেবল লেখক বন্ধুদের বিরুদ্ধেই নিলেন না, সমগ্র ফ্রান্সকেই তিনি আঘাত করলেন। তিনি নিলামে উঠালেন ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সেই সব বই, যেগুলি ঐ লেখক বন্ধুরা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নিতে জিদ এর পক্ষ হয়ে দাঁড়াননি। জিদ এর গ্রন্থাগার নিলামে উঠার বিজ্ঞাপন যখন প্রচারিত হলো তখন স্বভাবতই সমগ্র ফ্রান্সের চেতনা লুপ্ত হওয়ার কথা। কারণ সমকালীন একজন শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বিক্রয় করে দেবেন এটি যে কোনো সভ্য জাতির জন্যই অপ্রত্যাশিত ও দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ। ফলে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার পর প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ফরাসিরা তড়িঘড়ি করে নিলামখানায় ভিড় জমালো।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।
---	--

১. “বই কেনা” প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখুন।
২. “বই কেনা” প্রবন্ধ অবলম্বনে বই পড়া ও কেনার প্রতি বাঙালির অনীহার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৩. বাঙালির চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখকের পরিহাসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।
৪. লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুসরণে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বইয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।
৫. “বই কেনা” প্রবন্ধ অবলম্বনে সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যসমূহ উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ চিহ্নিত করুন।

রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : “বই কেনা” প্রবন্ধ অবলম্বনে বই পড়া ও কেনার প্রতি বাঙালির অনীহার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসবোধের বিপরীতে বই পড়া ও কেনায় সহজাত অনীহা বাঙালির একটি নেতিবাচক চরিত্রবৈশিষ্ট্য। প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতবা আলী “বই কেনা” শীর্ষক রম্যপ্রবন্ধে বই পড়া ও কেনার প্রতি বাঙালির উদাসীনতার বিষয়টি তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রোপের আশ্রয়ে ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত বই কেনার ক্ষেত্রে বাঙালির স্বভাব-অনীহার অবসান কামনাই “বই কেনা” প্রবন্ধ রচনায় উদ্ভূত করেছে লেখককে।

ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বিশেষ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বই পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বইয়ের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পায়। এর ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। আনাতোল ফ্রাঁস মাছির মাথার চারদিকে চক্রাকারে থাকা অসংখ্য চোখের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আপসোস প্রকাশ করলেও শেষে এ উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন যে, মাছির অসংখ্য চোখ থাকলেও তার মনশ্চক্ষু নেই। ফলে মাছি কেবল বস্তুজগৎকেই দেখতে পায়। কিন্তু মানুষ তার দুচোখ দিয়ে বইয়ের মাধ্যমে বিশাল জ্ঞান জগতে প্রবেশ করতে পারে। বারট্রান্ড রাসেলও মনে করেন মানুষের মনশ্চক্ষু আছে বলেই যে বইয়ের মাধ্যমে তার মনের চোখকে বিকশিত করতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে অসংখ্য নিজস্ব ভুবন। আনাতোল ফ্রাঁস এবং বারট্রান্ড রাসেল এভাবেই মানবজীবনে গ্রন্থের ভূমিকাকে চিহ্নিত করেছেন। বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা ও রসবোধের স্বীকৃতি সানন্দে তিনি দিয়েছেন, কিন্তু তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রোপবাণে বিদ্ধ করে বই পড়া ও কেনার ব্যাপারে বাঙালির উদাসীনতা, অনীহা ও খোড়া অজুহাতকে উপহাস করেছেন তিনি। লেখক স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন :

“পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য উপন্যাসের এক চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা বইয়ের ক্রমবর্ধমান মূল্য বাঙালির গ্রন্থ বিমুখতার অন্যতম একটি কারণ, তবে এটি মুখ্য কারণ নয়। বইয়ের দাম যদি কম হয়, তবে তার কাটতি বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সংখ্যার বিচারে পৃথিবীতে

বাংলা ভাষা-ভাষীদের অবস্থান ছয়/সাত নম্বরে হলেও ফরাসি প্রকাশক যেখানে একটি গ্রন্থের বিশ হাজার কপি নির্দিধায় ছাপাতে পারেন, বাঙালি প্রকাশকের পক্ষে সেখানে দু'হাজার কপি বই ছাপাতে নাভিশ্বাস উঠে। ফলে বইয়ের দাম বেশি বলে বাঙালি বই কেনে না, আবার বইয়ের কাটতি কম বলেই প্রকাশক বইয়ের দাম কমাতে পারে না। পাঠক প্রকাশক সম্পর্কের এ চক্র অচ্ছেদ্য। সম্পর্কের এচক্র ছিন্ন করা প্রয়োজন বলে লেখক মনে করেন। এবং এক্ষেত্রে ক্রেতা বা পাঠককে এগিয়ে আসার আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস বই কিনে কেউ কখনো দেউলে বা সর্বস্বান্ত হয় না। সমগ্র পৃথিবীর সভ্য মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক সংগ্রহের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করে। ধার করা বই ফেরৎ না দিয়ে পর্যন্ত তারা গড়ে তোলে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। কিন্তু বাঙালির কাছে গ্রন্থ ক্রয় করা অপব্যয় তুল্য। অথচ গ্রন্থ ক্রয় করা যে খরচ নয় বিনিয়োগ এ চিন্তা বাঙালি মাথায় রাখে না। বাঙালির বই দীনতা পীড়িত করেছে লেখককে। বাঙালি যদি আফ্রিকার কোনো আদিবাসী অসভ্য জনগোষ্ঠী হতো তাহলে কথা ছিলো না। বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু বই কেনার সময় প্রচণ্ড উদাসীন এবং কৃপণ।

বই পড়া এবং বই কেনার প্রতি বাঙালির অনীহার এ সব কারণই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কৌতুক ও পরিহাসের ছলে উপস্থাপন করে বাঙালি মানসের এ গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সংশোধন প্রত্যাশা করেছেন লেখক।

প্রশ্ন : “বই কেনা” প্রবন্ধ অবলম্বনে সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্যসমূহ উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ চিহ্নিত করুন।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথের পর যে ক'জন গদ্যশিল্পী বাংলা গদ্যচর্চায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁদের অন্যতম। সৈয়দ মুজতবা আলীকে বাক্শিল্পী কথা-রসিক ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। তবে ভ্রমণ ও রম্যসাহিত্য লেখক হিসেবেই তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন ‘বহুভাষাবিদ’ এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর রচনায় বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে বিদ্রূপ-কৌতুক ও হাস্যরসের। তবে নিছক হাস্যরস সৃষ্টির জন্যই তিনি লেখেননি, তাঁর প্রতিটি রচনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে গভীর অর্থ।

পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত ‘বই কেনা’ প্রবন্ধটি সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি বিশিষ্ট রচনা। এতে হাস্য-কৌতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয়ে বাঙালির গ্রন্থবিমুখতার সমালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য বাঙালি নিজের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের জন্য বই পড়ুক, বেশি বেশি করে বই কিনুক। কেননা বইয়ের মাধ্যমেই বাঙালি অসংখ্য ভ্রূবন সৃষ্টি করতে পারবে। জ্ঞানজগৎ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুসভ্য পৃথিবীর বৃহত্তর আঙ্গিনায় সে তার সুদৃঢ় অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর স্বতন্ত্র গদ্যশৈলীর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত “বই কেনা” প্রবন্ধ। হাসি ও কান্না, পরিহাস ও অভিমান এবং লঘু ও গুরু মতো পরস্পর বিপরীত বিষয় অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর গদ্যে ধারণ করতে পারেন। তাঁর গদ্যের এ বিশিষ্টতা “বই কেনা” প্রবন্ধেও সহজেই লক্ষ করা যায়। এ প্রবন্ধে লেখক বাঙালিদের নিয়ে পরিহাস করেছেন, তীব্র ব্যঙ্গ ও কৌতুকের সাহায্যে বাঙালির মানস-দৈন্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তবে বিদ্রূপ ও পরিহাসের মধ্যেই প্রবন্ধটির আবেদন নিঃশেষিত হয়নি তাঁর প্রত্যাশা বাঙালির বোধোদয় ঘটবে; বই পড়া ও কেনার অভ্যাস তৈরি হবে বাঙালি সমাজে। জ্ঞানজগতের বৃহত্তর আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করবে বাঙালি এ বিশ্বাস তাঁর এ জন্যেই তীব্র বিদ্রূপবাণ ছুঁড়ে তিনি বলেন।

“বাঙালির বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে; আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।”

বাংলা গদ্যে বৈঠকি রীতির সার্থক ব্যবহার সৈয়দ মুজতবা আলীর বড় অবদান। বৈঠক বা আড্ডায় আলাপচারিতার যে রীতি বাঙালি সমাজে প্রচলিত, লেখক বাংলা গদ্যে তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। “বই কেনা” রচনাটিকে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা হলেও, প্রবন্ধের প্রচলিত কাঠামোর সঙ্গে এর পার্থক্য বিস্তর। এতে রয়েছে বিভিন্ন কাহিনী ও টিপ্পনী যার গভীরে নিহিত আছে লেখকের বিশেষ উদ্দেশ্য। যেমন, বাঙালির মানস দীনতার স্বরূপ উন্মোচনে লেখকের কৌতুকবোধ ও বৈঠকি চালের মিশ্রণ লক্ষ করা যায় নিম্নে উপস্থাপিত দুটি উদ্ধৃতিতে :

ক) “পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত। আমরা ততই আরব্য উপন্যাসের এক চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

খ) কিন্তু বাঙালি নাগর ধর্মের কাহিনী শোনে না। তার মুখে ঐ এক কথা— “অত কাঁচা পয়সা কোথায় বাওয়া, যে বই কিনব”।

ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষ সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে লিখেছেন— “পরিহাসের তলায় অনেক গ্লানি লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ।” “বই কেনা” প্রসঙ্গেও এ-মন্তব্য সমান প্রাসঙ্গিক। বই কেনা ও পড়ার ব্যাপারে বাঙালির স্বভাবগত অনিচ্ছার কলঙ্ক জাতিসত্তার উত্তরাধিকারী হিসেবে লেখককেও যে স্পর্শ করে প্রবন্ধটি পাঠশেষে এ ভাবনা পাঠককে বিমূঢ় করে তোলে। তিনি যখন লিখেন—


“জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, ‘বাঙালীর পয়সার অভাব।’ বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না, সিনেমার টিকিট কাটার ‘কিউ, থেকে?’”

—তখন জাতিগত পরিহাস নির্মম আত্মরিহাসে পরিণত হয়। পরিহাসের উপযুক্ত গদ্য তাঁর আয়ত্তে ছিলো বলেই লেখকের পক্ষে এ রকম আত্মাভী কৌতুক পরিবেশন করা সম্ভব হয়েছে।

“বই কেনা” প্রবন্ধের বৈঠকি-রীতির গদ্যে প্রবন্ধকার একটি গুরুগম্ভীর বিষয়কে লঘু আবরণে ঢেকে রেখেছেন। বক্তব্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য এতে একাধিক জ্ঞানগর্ভ ও কৌতুক বা গল্প তিনি উপস্থাপন করেছেন। ভাষায় আলাপচারিতার বা বৈঠকি চং সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি আরবি ফারসি ও ইংরেজি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন অবলীলায়।

যুক্তির ব্যবহার, বুদ্ধির প্রয়োগ, ভাষার সহজতা, আড্ডা বা বৈঠকের ভঙ্গি, বিভিন্ন ভাষার শব্দের উল্লেখ এবং কৌতুক বিদ্রূপ পরিহাস সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের সবকটিরই প্রকাশ লক্ষ করা যায় “বই কেনা” প্রবন্ধে। “বই কেনা” সৈয়দ মুজতবা আলীর গদ্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।
---	---

সন্ধি : দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। এতে দুটি ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন বা লোপ হতে পারে। ধ্বনির এরকম মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে। সন্ধি তিন রকম : স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি; বিসর্গসন্ধি।

স্বরসন্ধি : একটি স্বরধ্বনির সঙ্গে আর একটি স্বরধ্বনির মিলনকে বলা হয় স্বরসন্ধি। “বই কেনা” প্রবন্ধে স্বরসন্ধি যোগে গঠিত শব্দের দৃষ্টান্ত— চক্র+আকার (চক্রাকার), যথা+ইষ্ট (যথেষ্ট); ন+ছেদ্য(অচ্ছেদ্য), জন+এক (জনৈক)।

ব্যঞ্জনসন্ধি : ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধিকে বলা হয় ব্যঞ্জনসন্ধি। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যঞ্জনসন্ধি যোগে গঠিত শব্দের দৃষ্টান্ত— সম+মান(সম্মান); বিপৎ+কালে (বিপদকালে)।

বিসর্গসন্ধি : পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরপদের ব্যঞ্জনধ্বনি অথবা স্বরধ্বনির সন্ধিকে বিসর্গসন্ধি বলা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বিসর্গসন্ধি যোগে গঠিত শব্দের দৃষ্টান্ত চতুঃ+দিক (চতুর্দিক); মনঃপুত (মনঃপুত)।

বিপরীতার্থক শব্দ : একটি শব্দ যে ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, অন্য একটি শব্দ, তার বিপরীত ভাব বা অর্থবোধক হলে, শব্দ দুটিকে পরস্পরের বিপরীতার্থক শব্দ বা বিপরীত শব্দ বলা হয়। ‘বই কেনা’ প্রবন্ধ থেকে কিছু শব্দ বাছাই করে সেগুলির বিপরীত শব্দ নিম্নে উপস্থাপন করা হল :

শব্দ

বন্ধু

বিপরীত শব্দ

শত্রু

নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ
উত্তম	অধম
সম্মান	অসম্মান
বিষ	অমৃত
খাঁটি	নকল
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ

বিশেষ্য ও বিশেষণ

যে পদ কোনো কিছুর নাম প্রকাশ করে তা-ই বিশেষ বা নামপদ। আর, বাক্যস্থিত কোনো পদের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম ইত্যাদি বোঝানোর জন্য যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে বিশেষণ বলে। ‘বই কেনা’ প্রবন্ধ থেকে কিছু বিশেষণ পদ বাছাই করে সেগুলির বিশেষ্য রূপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

বিশেষণ	বিশেষ্য
গুণী	গুণ
জ্ঞানী	জ্ঞান
পাণ্ডিত	পাণ্ডিত্য
মঙ্গল	মঙ্গলিক/মঙ্গল্য
নিরাশ	নৈরাশ্য/নিরাশা

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

- সংকলিত প্রবন্ধ থেকে পাঁচটি শব্দ বাছাই করে এগুলির একাধিক প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ উপস্থাপন করুন।
- “বই কেনা” প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি প্রথমে সাধু ভাষা রীতিতে রূপান্তর করুন। এরপর মূল প্রবন্ধটি দূরে সরিয়ে রেখে রূপান্তরিত অংশটি পুনরায় চলিত ভাষারীতিতে রূপান্তর করুন। এ ব্যাপারে প্রবন্ধের মূল অনুচ্ছেদটির সঙ্গে আপনার নিজের অনুশীলনীটি মিলিয়ে নিন। আপনার কোনো ভুল হলে সংশোধন করে নিন।
- নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি রচনা লিখুন :
আমার দেখা একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

আরও যা পড়তে পারেন

সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত ‘দেশে বিদেশে’, পঞ্চতন্ত্র ১ম ও ২য় খণ্ড, চাচা কাহিনী, জলেডাঙায় ইত্যাদি গ্রন্থ।

পদ্মানদীর মাঝি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

বাংলা কথাসাহিত্যে যে ক'জন শিল্পীর নাম অবিস্মরণীয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। পিতার কর্মস্থল, বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলার দুমকা শহরে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯মে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। মানিক তাঁর ডাকনাম, পিতার দেয়া নাম প্রবোধকুমার। তাঁর লেখক-নামের মহিমায় প্রবোধচন্দ্র নামটি ঢাকা পড়ে গেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা সুন্দরী দেবী। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আদি নিবাস ছিলো বাংলাদেশে, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। পিতার সরকারি চাকুরির কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার এবং বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার ওয়েসলিয় মিশন কলেজ থেকে আই এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর অংকশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। এ-সময়েই বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে লিখে ফেলেন প্রথম গল্প 'অতসী মামী', যা ছাপা হয় বিচিত্রা পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। বিচিত্রা-য় গল্প প্রকাশের পর থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন সার্বক্ষণিক লেখক। ফলে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করে বিজ্ঞানী হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করতে হয় তাঁকে।

শেষ অবধি সার্বক্ষণিক সাহিত্যিক রূপেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ মার্কসবাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। এরই ক্রমধারায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাভ করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয় সীমাহীন আর্থিক অনটন আর মৃত্যুমুখী ব্যাধির মধ্য দিয়ে। ১৯৫৬ সনের ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

মনোবিশ্লেষণ, বাস্তববাদী জীবনদৃষ্টি, সাম্যবাদী জীবনদৃষ্টি, সাম্যবাদে আস্থা এবং মানুষের মধ্যকার সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা সাহিত্যের মূল শ্রেণী। ছোট গল্প ও উপন্যাস এ দু'শাখাতেই সমান কুশলী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচিত শিল্পসফল অসামান্য কিছু ছোট গল্প ও উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

উপন্যাস : জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)

অহিংসা (১৯৪১), চিহ্ন (১৯৪৭, চতুষ্কোণ (১৯৪৮)।

ছোটগল্প : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪০), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)।

নাটক : ভিটেমাটি (১৯৪৬)

কবিতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৭০)

প্রবন্ধ : লেখকের কথা (১৯৫৭)

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের বিষয় সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করবেন।
২. দরিদ্র মানুষের জীবন নিয়ে লিখিত একটি অসাধারণ সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।

ভূমিকা

লেখক জীবনের সূচনা পর্যায়ে রচিত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনা থেকে কিছু অংশ সংকলন করা হয়েছে বর্তমান পাঠে।

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে পদ্মা তীরবর্তী মাঝি ও জেলেশ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার কথা এবং ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের মাঝিরও জীবিকার অবলম্বন পদ্মা, এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপন্যাসটির সার্থক নামকরণ 'পদ্মানদীর মাঝি'।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত রচনাংশে পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুমে জেলে জীবনের বাস্তবতা মাছ ধরার খুঁটিনাটি দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবন ইত্যাদি শিল্পীর তুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পদ্মানদীর মাঝি সাধু ভাষারীতিতে লিখিত। তবে সর্বনামপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ সহজেই চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখের রচনায়ও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সচেতন কথা শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও রচনারীতির এটি এক বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মৎস্যজীবী সমাজের চরিত্রসমূহের সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ফলে উপন্যাসটি অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- ◆ ইলিশ মাছ ধরার মরসুমে পদ্মার পরিবেশ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ◆ কয়েকজন মৎস্যজীবীর পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় বলতে পারবেন।



মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
পদ্মা – বাংলাদেশে প্রবাহিত গঙ্গার নিম্নভাগ পদ্মানদী নামে পরিচিত।	বর্ষার মাঝামাঝি।
মরসুম – (আ. মৌসিম>মৌসুম> মরসুম।	পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ-ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনভাবে নদী বক্ষে রহস্যময়, অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চারিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে রেল-স্টেশনে ও জাহাজ ঘাটে শান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষ রাত্রের ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি উঠে। জেলে-
কামাই – (ফা. কম+বা আই) বিরাম।	
অনির্বাণ – কখনো নেভে না এমন,	

চির জ্বলন্ত ।	নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না । নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ । লষ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চক্‌চক্ করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায় ।
সঞ্চরিত – পরিচালিত, আন্দোলিত ।	কুবের মাঝি আজ মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে । নৌকায় আরও দুজন লোক আছে । ধনঞ্জয় এবং গণেশ । তিনজনের বাড়িই কেতুপুর গ্রামে ।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা – এখানে ছেঁড়া ছেঁড়া অর্থে ।	আরও দু-মাইল উজানে পদ্মার ধারেই কেতুপুর গ্রাম ।
খোল – কোটর, গহ্বর ।	নৌকাটি বেশি বড় নয় । পিছনের দিকে সামান্য একটি ছাউনি আছে । বর্ষা বাদলে দুতিন জনে কোনরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে । বাকি সবটাই খোলা । মাঝখানে নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক রাখা হইয়াছে । এ ফাঁক দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে মাছ ধরিয়া জমা করা হয় । জাল ফেলিবার ব্যবস্থা পাশের দিকে । ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমে বিপুল পাখার মতো জালটি নৌকার পাশে লাগানো আছে । জালের শেষ সীমার বাঁশটি নৌকার পার্শ্বফ্রেমের সঙ্গে সমান্তরাল । তার দুই প্রান্ত হইতে লম্বা দুটি বাঁশ নৌকার ধারে আসিয়া মিশিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নৌকার ভিতরে হাত দুই আগাইয়া আসিয়াছে । জালের এ দুটি হাতল । এ হাতল ধরিয়া জাল উঠানো এবং নামানো হয় ।
নিষ্পলক – পলকহীন ।	গভীর জলে বিরাট ঠোঁটের মতো দুটি বাঁশের বাঁধা জাল লাগে । দড়ি ধরিয়া বাঁশের ঠোঁট হাঁ করা জাল নামাইয়া দেয়া হয় । মাছ পড়িলে খবর আসে জেলের হাতের দড়ি বাহিয়া, দড়ির দ্বারা জলের নিচে জালের মুখ বন্ধ করা হয় ।
স্বচ্ছনীলাভ – অতিশয় পরিষ্কার । নীলবর্ণযুক্ত ।	ঐ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি । জালটাও তারই । প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের । নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম । আগা-গোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে । কুবের ও গণেশ হাতল ধরিয়া জালটা জলে নামায় এবং তোলে, মাছগুলি সঞ্চয় করে । পদ্মার চেউয়ে নৌকা টলমল করিতে থাকে, আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলে, জোর বাতাসেও নৌকার চিরস্থায়ী গাঢ় আঁশটে গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে না । একহাত একখানি কাপড়কে নেংটির মতো কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া, শীতল জলোবাতাসে শীত শীত বোধ করিয়া, বিন্দ্র আরক্ত চোখে লষ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত্রি মাছ ধরে । নৌকা স্রোতে ভাসিয়া যায় । বৈঠা ধরিয়া নৌকাকে তারা ঠেলিয়া লইয়া আসে সেইখানে যেখানে একেবারে বাঁকের মধ্যে জাল ঠেলিয়া বেশি মাছ উঠিয়াছিল । আজ খুব মাছ উঠিতেছিল । কিন্তু ভোরে দেবীগঞ্জে মাছের দর না জানা অবধি এটা সৌভাগ্য কিনা বলা যায় না । সকলেরই যদি এ রকম মাছ পড়ে, দর কাল এত নামিয়া যাইবে যে, বিশেষ কোন লাভের আশা থাকিবে না । তবে বড় মাছের বড় বাঁক একই সময়ে সমস্ত নদীটা জুড়িয়া থাকে না । এ যা ভরসার কথা । বেশি মাছ সকলের নাও উঠিতে পারে ।
উজান – স্রোতের বিপরীত দিক ।	কুবের হাঁকিয়া বলে, –যদু হে এ-এ -এ মাছ কিবা?
পাটাতন – তক্তার তৈরী নৌকার মেঝে ।	খানিক দূরের নৌকা হইতে জবাব আসে, জবর । জবাবের পর সে নৌকা হইতে পালটা প্রশ্ন করা হয় । কুবের হাঁকিয়া জানায় তাদেরও মাছ পড়িতেছে জবর ।
ফ্রেম – কাঠামো ।	
সমান্তরাল – সমান ব্যবধান বিশিষ্ট ।	
নেংটি – ছিন্ন মলিন বস্ত্র, লজ্জা নিবারণের অপরিপূর্ণ বস্ত্রখণ্ড ।	
বিন্দ্র – নিদ্রাহীন, ঘুমছাড়া ।	
আরক্ত – গাঢ় লাল, রক্তাভ ।	
যদু এ এ এ – মাছ কিবা? ওহে যদু, মাছ কেমন ধরা পড়েছে?	
জবর – দারুণ, বেজায়, অত্যন্ত (আ. জবর>জবর)	
সাঁঝের – সন্ধ্যার ।	
হালায় – শালায়, ঢাকার আঞ্চলিক উচ্চারণ ।	
জুত – মনমতো, নিখুঁত আরাম (সংযুক্তি>প্রা.যুক্তি>আঞ্চ.জুত) ।	


	<p>ধনঞ্জয় বলে, সাঁঝের দরটা জিগা দেখি, কুবের।</p> <p>কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যাবেলা আজ পৌনে পাঁচ, পাঁচ এবং সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, কাইল চাইরে নামব। হালায় মাছ ধইরা জুত নাই।</p> <p>কুবের কিছু বলে না। ঝপ্ করিয়া জালটা জলে ফেলিয়া দেয়।</p>
--	--

সার-সংক্ষেপ

পদ্মানদীতে ইলিশ মাছ ধরার মৌসুম বর্ষাকাল। রাতের বেলা অন্ধকার পদ্মাবক্ষে নৌকার শত শত আলো জানিয়ে দেয় মাছ শিকারীদের কথা। শহরে গ্রামে, রেলস্টেশনে ও জাহাজ ঘাটে মানুষ যখন নিশ্চিত্তে নিদ্রা যায় তখন রাতের অন্ধকারে দরিদ্র জেলে ও মাঝির দল মাছ ধরে। কুবের, ধনঞ্জয় আর গণেশ আজ মাছ ধরছিল। নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয়। সে তাই কেবল নৌকার হাল ধরে বসে থাকার সুবিধা নেয়, মাছ ধরার মূল পরিশ্রম করে কুবের আর গণেশ। মাছ বিক্রির অর্থের অর্ধেক পায় ধনঞ্জয়, বাকি অর্ধেক ভাগ হয় কুবের আর গণেশের মধ্যে।

বর্ষা প্রকৃতির জোর বাতাসও নৌকার আঁশটে গন্ধ ছাড়াতে পারে না। এক হাত মাপের কাপড় নেংটির মতো কোমরে জড়িয়ে ঘুমহীন রাতে জলে ভিজে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় কুবের আর গণেশ মাছ ধরে। আজ মাছ ধরা পড়ছিলো খুব। তবে সকল মাঝির জালেই যদি প্রচুর মাছ ধরা পড়ে তাহলে ব্যাপারটি আর লাভজনক হবে না। পর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে দেবীগঞ্জের মাছের দর পড়ে যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	<p>নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।</p>
---	---

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

- ইলিশ ধরার মরসুমে পদ্মার জেলে নৌকাগুলির বর্ণনা দিন।
- কুবের, ধনঞ্জয় ও গণেশের বাড়ি কোথায়?
- ধনঞ্জয়-এর সম্পত্তির পরিচয় দিন। মাছ শিকারের সময় ধনঞ্জয় কী ভূমিকা পালন করে?
- জালে মাছ কিভাবে ধরা পড়ে তার বর্ণনা দিন।
- বেশি মাছ ধরা পড়ার অর্থই সৌভাগ্য নয় কেন?
- ‘যদু হে এ এ এ মাছ কিবা? – কার উক্তি? এ উক্তি ও তার উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : ধনঞ্জয় এর সম্পত্তির পরিচয় দিন। মাছ শিকারের সময় ধনঞ্জয় কী ভূমিকা পালন করে?

উত্তর : কুবের ও গণেশ যে নৌকা ও জালের সাহায্যে মাছ ধরে তার মালিক ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের নৌকাটি বেশি বড় নয়। বর্ষা বাদলে দু’তিনজন কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকতে পারে এমন একটু ছাউনি আছে নৌকাটির পেছনের দিকে। বাকি সবটুকুই খোলা। নৌকার পাটাতনে হাত দুই ফাঁক এ ফাঁকা— গলিয়ে খোলের মধ্যে ধরা মাছ রাখা হয়। ত্রিকোণ বাঁশের ফ্রেমের বিরাট পাখার মতো জালটির দুটি হাতল। হাতল ধরে জাল ফেলা ও উঠানো হয়। জালটি নৌকার পাশে লাগানো থাকে। নৌকা ও জালের মালিক হওয়ার সুবাদে ধনঞ্জয় ধরা মাছের অর্ধেক ভাগ পায়। বাকি

অর্ধেক পায় কুবের ও গণেশ। নৌকা ও জালের মালিক হওয়ার ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। মাছ ধরার পুরো সময়টাই সে হাল ধরে বসে থাকে।

প্রশ্ন : বেশি মাছ ধরা পড়ার অর্থই সৌভাগ্য নয় কেন?

উত্তর : পদ্মার ইলিশ ধরার মরসুমে বেশি মাছ ধরা পড়া সময় সময় সৌভাগ্য বহন করে আনে না। সকল জেলের জালেই বেশি মাছ ধরা পড়লে দেবীগঞ্জের হাটে মাছের দর পড়ে যায়। কাজেই দেবীগঞ্জের মাছের দর না জানা অবধি কুবের বা গণেশ মাঝিরা সব সময় বিষয়টিকে সৌভাগ্য বলে গ্রহণ করতে পারে না। তবু তারা আশায় বুক বাঁধে এ ভরসায় যে বড় মাছের বড় ঝাঁকে একই সময়ে পুরো নদী জুড়ে চলাচল করে না।

প্রশ্ন : ‘যদু হে এ এ এ মাছ কিবা? – কার উক্তি? এ উক্তি ও তার উত্তরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : অদূরবর্তী নৌকার জেলে যদুর উদ্দেশ্যে এটি বলা হয়েছে। উক্তিটি কুবের এর খানিক দূরের নৌকা থেকে জিজ্ঞাসাসূচক এ উক্তির জবাব আসে ‘জবর’।

ধনঞ্জয়ের নৌকা ও জাল দিয়ে ইলিশ ধরছিল কুবের ও গণেশ। নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয় নিয়ম মারফিক হাল ধরে বসেছিল। আজ জালে মাছ ধরা পড়ছিলো প্রচুর। কিন্তু প্রচুর মাছ সব সময় সৌভাগ্য বহন করে আনে না। অন্যান্য জেলের জালেও যদি প্রচুর মাছ ধরা পড়ে তাহলে দেবীগঞ্জের হাটে মাছের দর পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে প্রচুর মাছ ধরেও গণেশ কুবের ধনঞ্জয় বাড়তি টাকার মুখ দেখবে না। নিজেদের জালে প্রচুর মাছ ধরা পড়তে দেখে কুবের অনতিদূরের জেলে নৌকার মাঝি যদুর উদ্দেশ্যে মাছ কেমন ধরা পড়েছে জানতে চেয়েছে ঐ উক্তির মাধ্যমে। জবাব এসেছে ‘জবর’। অর্থাৎ অন্য নৌকার জালেও ধরা পড়েছে প্রচুর মাছ। কুবের জিজ্ঞাসায় আশার যে দ্যুতি জড়ানো ছিলো, অদূরবর্তী নৌকা থেকে আসা উত্তর ‘জবর’ ঐ প্রত্যাশাকে স্তিমিত করে দিয়েছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

- শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না।
- আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়ান বসিয়া থাকে।
- ‘কাইল চাইরে নামব। হালায় মাছ ধইরা জুত নাই,

শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না।

আলোচ্য অংশটুকু কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের সংকলিত আখ্যান ভাগ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ভরা বর্ষার শেষরাতে ইলিশ মাছ ধরার মরসুমে পদ্মার পরিবেশ এ অংশে লেখক চমৎকারভাবে অঙ্কন করেছেন।

ভরা বর্ষা পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম। ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে দিনরাত মাছ ধরায় নিযুক্ত থাকে জেলেরা। বেশি শ্রমের অর্থই যেহেতু বেশি উপার্জন সেহেতু দরিদ্র মৎস্যজীবীরা ইলিশের মরসুমে বিশ্রামের কথা ভাবে না। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়ালে চোখে পড়ে ‘নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকীর মতো’ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওগুলি আসলে ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য জেলে নৌকার আলো। সারারাত ধরেই রাতের রহস্যময় অন্ধকারে ঐ আলোগুলো চলাচল করে। মাঝরাত্রি যখন পার হয়ে যায়, তখন শহরে গ্রামে রেল স্টেশনে ও জাহাজ ঘাটে শান্ত মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু জেলে নৌকার আলো তখনও নেভে না। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তারা। ইলিশের সন্ধানে জীবনীশক্তির

অবশেষটুকু তারা উজাড় করে দেয়। সারা দেশের মানুষ যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন ভাঙা ভাঙা মেঘের আড়ালে থেকে জেগে ওঠে আকাশের ক্ষীণ চাঁদ। যে ইলিশ দিনের বেলা শহর বন্দরের ভোজন রসিকের রসনাকে তৃপ্ত করবে, সেই ইলিশ শিকার কাহিনীর সাক্ষী থাকবে কেবল ঐ ক্ষীণ চাঁদ। মরা ইলিশের নিষ্পলক চোখ যাদের কাছে নীলাভ মণির মতো মনে হয়, সেই জেলেদের নৌকার আলো শেষ রাতেও নেভে না।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ◆ কুবের-এর সাংসারিক জীবনের দুঃখ দুর্দশার কথা লিখতে পারবেন।
- ◆ গণেশ ও কুবের-এর মধ্যকার সম্পর্কের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ দিবসের সূচনায় জাহাজ ঘাট ও মেছো নৌকার ঘাটের পরিবেশ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
বারণ – নিষেধ।	শরীরটা আজ তাহার ভাল ছিল না। তার স্ত্রী মালা তাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা লইতে পারে নাই। সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল তার নাই। ধনঞ্জয় অথবা নড়াইলের যদুর সঙ্গে সমস্ত বছর তাকে এমনিভাবে দু-আনা চার-আনা ভাগে মজুরি খাটিতে হইবে। ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে যে তার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।
জমা (আ. জমআ) – থোক অর্থের বিনিময়ে বার্ষিক বন্দোবস্ত।	নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যারা পাতিতে পারে তাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এতবড় পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মতো গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থায় যে মাছ পড়ে, তার দু-তিন আনা ভাগে কারো সংসার চলে না। উপার্জন যা হয় এ ইলিশের মরসুমে। শরীর থাক আর যাক, এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না।
নড়াইল – বৃহত্তর যশোরের একটি মহকুমা। বর্তমানে বাংলাদেশের একটি জেলা।	মাঝরাতে একবার তারা খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে কুবের বলিল-একটু জিরাই গো, আজান খুড়া।
মীনসন্তান – মৎস্য, মাছ।	জিরানের লাইগা মরস ক্যান, ক দেখি? বাড়িতে গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল।
নদীর মালিক – সরকার, জমিদার।	কুবের বলিল, উহু তামুক বিনা গায়ে সাড়া লাগে না। দেহখানা জান গো আজান খুড়া, আইজ বিশেষ ভাল নাই।
খাজনা – রাজস্ব, জমিদারের প্রাপ্য কর।	জাল উঁচু করিয়া রাখিয়া কুবের ও গণেশ ছইয়ের সামনে বসিল। ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কলিকাটিতে তামাক সাজিল কুবের।
জীবিকা – জীবনধারণের জন্য অবলম্বিত পেশা বা বৃত্তি।	নারিকেল-ছোবড়া গোল করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল। বারো বছর বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া হাত
জিরাই (ফা. জিরয়ান) – বিশ্রাম করি, আরাম করি।	
খুড়া – চাচা, কাকা, এখানে পিতৃব্য স্থানীয় অর্থে।	
মরস ক্যান – ব্যাকুল কেন।	
খেপ – মাছ ধরবার জন্য জাল নিষ্ক্ষেপণ।	
তামুক – তামাক।	
সাড়া – চেতনা, অনুভূতি।	

ছই – নৌকার ছাদ ।	একেবারে পাকিয়া গিয়াছে ।
ছঁকা – নারকেলের খোলে প্রস্তুত তামাক সেবনের হাতে তৈরি যন্ ।	নৌকা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল । একহাতে তীরের দিকে কোণাকুণি হাল ধরিয়া ধনঞ্জয় অন্য হাতটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল, দে কুবের আমারে দে, ধরাই ।
দা-কাটা – দা দিয়ে কাটা ।	কলিকাটি তাহার হাতে দিয়া কুবের রাগ করিয়া বসিয়া রহিল । কুবেরের পাশে বসিয়া গণেশ বাড়াবাড়ি রকমের কাঁপিতেছিল । এ যেন সত্য সত্যই শীতকাল । হঠাৎ সে বলিল, ইঃ, আজ কি জাড়, কুবের ।
কঙ্কে – মাটির তৈরি ছোট যে পাত্রে তামাক সাজা হয় ।	কথাটা কেহ কানে তুলিল না । কারো সাড়া না পাইয়া কুবেরের হাঁটুতে একটা খোঁটা দিয়া গণেশ আবার বলিল, জানস কুবের, আইজকার জাড়ে কাইপা মরলাম ।
কলিকাটি – কঙ্কেটি ।	এদের মধ্যে গণেশ একটু বোকা । মনের ক্রিয়াগুলি তার অত্যন্ত শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয় । সে কোন কথা বলিলে লোকে যে তাহাকে অবহেলা করিয়াই কথা কানে তোলে না, এটুকুও সে বুঝিতে পারে না । একটা কিছু জবাব না পাওয়া পর্যন্ত বারবার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে । ধমকের মতো করিয়া যদি কেউ তার কথার জবাব দেয়, তাতেও সে রাগ করে না । দুঃখও তাহার হয় কিনা সন্দেহ ।
বাড়াবাড়ির – ভীষণভাবে ।	কুবেরের সে অত্যন্ত অনুগত । জীবনের ছোট বড় সকল ব্যাপারে সে কুবেরের পরামর্শ লইয়া চলে । বিপদে আপদে ছুটিয়া আসে তাহারই কাছে । এক পক্ষের এ আনুগত্যের জন্য তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে ঘনিষ্ঠ বলিতে হয় । দাবি আছে, প্রত্যাশা আছে, সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে, কলহ এবং পুনর্মিলনও আছে । কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ঝগড়া তাহাদের হয় খুব কম ।
জাড় (হি. জাড়, সং জাড়া) – শীত, ঠাণ্ডা, হিম ।	পুড়িয়া শেষ হওয়া অবধি তাহারা পালা করিয়া তামাক টানিল । নৌকা এখন অনেক দূরে আগাইয়া আসিয়াছে, কলিকার ছাই জলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছকাটি ছইয়ে টাঙ্গাইয়া দিয়া জাল নামাইয়া কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরিল ।
কাঁইপা – কেঁপে ।	গণেশ হঠাৎ মিনতি করিয়া বলিল, একখানা গীত ক দেখি কুবের ।
শ্লথ গতি – ধীর গতি ।	- হ, গীত না তর মাথা ।
পুনরাবৃত্তি – পুনরায় বলা কথা ।	কুবেরের ধমক খাইয়া গণেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল । তারপর নিজেই ধরিয়া দিল গান । সে গাহিতে পারে না । কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না । ধনঞ্জয় ও কুবের মন দিয়া গানের কথাগুলি শোনে । যে যাহারে ভালবাসে সে তাহারে পায় না কেন, গানে এ গভীর সমস্যার কথা আছে । বড় সহজ গান নয় ।
অনুগত – বাধ্য (বিশেষণ পদ) ।	পূর্বদিক লাল হইয়া উঠা পর্যন্ত তাহারা জাল ফেলিয়া বেড়াইল । তারপর রওনা হইল জাহাজ-ঘাটের দিকে । সেখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতে চারিদিক আলো হইয়া উঠিল ।
আনুগত্য – (সং অনুগত+ম) বাধ্যতা (বিশেষ্যপদ) ।	নদীর তীরে নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে । থাকিয়া থাকিয়া স্টীমারের বাঁশি বাজিয়া উঠে । সশব্দে নোঙর তুলিয়া কোন স্টীমার ছাড়িয়া যায়, কোন স্টীমার ভিড়ে গিয়া জেটিতে । কলিকাতা হইতে ট্রেনটি আসিয়া পড়িয়াছে । ঘাটের ও স্টেশনের দোকান-পাট সমস্ত খোলা হইয়াছে । অনেকে নদীর জলে স্নান করিতে নামিয়াছে । মোটরবাহী অসংখ্য ছোট বড় নৌকা ঘাটে ভিড় করিয়া আসিয়াছে । ঘাটের দিকে বহুদূর অবধি তীর ঘেঁষিয়া কাদায় পোঁতা লগির সঙ্গে বাঁধা আরও যে কত নৌকা তার সংখ্যা নাই ।
কলহ – ঝগড়া ।	নদীতে শুধু জলের স্রোত । জলে-স্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ । মেছো নৌকার ঘাটটি একপাশে । ইতিমধ্যে অনেকগুলি নৌকা মাছ লইয়া হাজির হইয়াছে । হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে স্থানটি হইয়া উঠিয়াছে সরগরম । অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দরাদরি সম্পন্ন হইয়া হরদম মাছ কেনা-বেচা চলিতেছে । চালানের ব্যবস্থাও হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই ।
পুনর্মিলন – বিচ্ছেদের পর মিলন, এখানে ঝগড়ার পর মীমাংসা অর্থে ।	এ ব্যবস্থা ও কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সমস্ত রাত্রিব্যাপী পরিশ্রমের ক্লাস্তি
বইঠা – নৌকার ক্ষুদ্র দাঁড়বিশেষ ।	
গীত – গান ।	
জীবনের সাড়া – জীবনের জাগরণ ।	
নোঙর – শিকলের সঙ্গে বাঁধা লৌহ অঙ্কবিশেষ যা জলের নিচে ফেলে জাহাজ বেঁধে রাখা হয় ।	
স্টীমার – জাহাজ ।	
জেটি – জাহাজ থেকে মালপত্র নামাবার ও যাত্রী নামবার মঞ্চ ।	

<p>মোটরবাহী – ইঞ্জিনচালিত। লগি – বাঁশের লম্বা দণ্ড যা দ্বারা নৌকা চালানো হয়। অবিরাম – বিরামহীন। মেছো-নৌকার ঘাট – মাছ বহনকারী নৌকা যে ঘাটে ভিড়ে। দরাদরি – দরকষাকষি। হরদম – সর্বদা, প্রতিনিয়ত। চালান – রপ্তানি, বিক্রয়ার্থে মাল প্রেরণ।</p>	<p>ভুলিয়া কুবের প্রতিদিন খুশি হইয়া উঠে। আজ সে একেবারে বিমাইয়া পড়িয়াছিল। শেষরাত্রির দিকে শীত করিয়া বোধ হয় তাহার জ্বরই আসিয়াছে। চোখ দুটোর যে তাহার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছে গণেশ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছে চার-পাঁচ বারের বেশি।</p>
---	--

সার-সংক্ষেপ

কুবের-এর শরীর ভালো না থাকায় স্ত্রী মালা মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করেছিলো আজ। কিন্তু শরীরের দিকে তাকাবার অবসর কোথায় কুবের-এর। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুর এবার বন্দোবস্ত নিতে পারেনি কুবের। পদ্মার ওপর নির্ভর করেই সারাটা বছর কাটাতে হবে তাকে। অন্যের নৌকা ও জাল ব্যবহার করে ভাগে মজুরি ছাড়া উপায় নেই তার।

কুবের কঙ্কেতে তামাক সাজে। ধনঞ্জয় হাত বাড়িয়ে দেয় কঙ্কেটির জন্য। কুবের কঙ্কেটি দিয়ে রাগ করে বসে থাকে। গণেশ শীতে ভীষণ রকম কাঁপছিলো।

পুড়ে শেষ হওয়া অবধি পালা করে তারা তিনজন তামাক টানে। শেষে জাল নামিয়ে কুবের ও গণেশ বৈঠা ধরে। পূর্বদিক লাল হয়ে ওঠা পর্যন্ত তারা জাল ফেলে বেড়ালো। শেষে রওয়ানা হলো জাহাজ ঘাটের দিকে। নদীর তীরে এবং নদীর বুকে এখন জীবনের সাড়া পড়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য নৌকার ভিড় জমেছে ঘাটে।

মেছো নৌকার ঘাটটি এক প্রান্তে। ইতোমধ্যে অনেকগুলো নৌকা মাছ সমেত ঘাটে ভিড়েছে। দরাদরিতে সরগরম হয়ে উঠেছে ঘাট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন



নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

- স্ত্রীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে কুবের কোন মাছ ধরতে এসেছে?
- কুবেরের তামাক সাজার বর্ণনা দিন।
- গণেশ চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।
- দেবীগঞ্জের প্রভাতকালীন জাহাজ ঘাটের বিবরণ দিন।
- সকালের মেছো-নৌকার ঘাটের পরিবেশ সম্পর্কে লিখুন।

প্রশ্ন : গণেশ চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

উত্তর : কেতুপুর গ্রামের অধিবাসী গণেশ কিছুটা নির্বোধ প্রকৃতির। মনের ক্রিয়াগুলি তার মছরগতিতে সম্পন্ন হয়। একই কথা বারবার উচ্চারণ করা তার অভ্যাস অথচ তার কথা যে লোকে অবহেলা করেই কানে তোলে না এটুকু সে বুঝতে পারে না। জবাবে কেউ ধমক দিলেও সে রাগ করে না। দুঃখ পায় না।

মৎস্যজীবী গণেশ কুবের মাঝির অত্যন্ত অনুগত। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সে কুবেরের পরামর্শ নিয়ে চলে। গণেশের একতরফা আনুগত্যের কারণেই কুবেরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছে। এ দুজনের সম্পর্কের মধ্যে দাবি ও প্রত্যাশা এবং সুখ-দুঃখের ভাগাভাগি আছে। তাদের মধ্যে সাময়িক কলহ হয় আবার পুনর্মিলনও ঘটে। কিন্তু গণেশ অত্যন্ত নিরীহ স্বভাবের বলেই এ-দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয় খুবই কম। গণেশ অত্যন্ত পরিশ্রমী। আপন মনে কাজ করে সে। গলায় সুর না থাকলেও শান্তিতে আপন মনে গান করে সে। স্বভাব বোকা বলেই ধনঞ্জয় প্রায়ই তাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে।

প্রশ্ন : দেবীগঞ্জের প্রভাতকালীন জাহাজ ঘাটের বিবরণ দিন।

উত্তর : প্রভাতে পূর্বদিক যখন লাল হয়ে ওঠে দেবীগঞ্জের জাহাজঘাটে তখন জীবনের সাড়া জাগে। থেকে থেকে বাঁশি বেজে ওঠে স্টিমারের। সশব্দে নোঙর তোলে কোনো স্টিমার ছেড়ে যায়, কোনটি জেটিতে গিয়ে ভিড়ে, এ সময় কলকাতার ট্রেনও স্টেশনে এসে পৌঁছে। ঘাটেরও স্টেশনের সমস্ত দোকান চালু হয়ে যায়। নদীর জলে অনেকে স্নান করতে নামে। বিভিন্ন রকমের অসংখ্য ছোটবড় নৌকা ঘাটে এসে ভিড় করে। ঘাটের তীর ঘেঁষে বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয় নৌকার সারি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

- ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়।
- তীরে, নদীর জলে এখন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।
- স্থলে মানুষের অবিরাম জীবন প্রবাহ।

ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুল পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়।

উদ্ধৃত বাক্যটি কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের সংকলিত আখ্যান ভাগ থেকে নেয়া হয়েছে। এ বাক্যে ইলিশের মরসুম শেষে পদ্মার পরিবেশ সম্পর্কে লেখক একটি গভীর ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছেন।

কুবের মৎস্যজীবী দিনমজুর। পদ্মা তার জীবিকার সহায়স্থল। এ-বছর টাকার অভাবে সে অখিল সাহার পুকুর বন্দোবস্ত নিতে পারেনি। ফলে সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। কিন্তু তার নিজের নৌকা নেই, জাল নেই। বাধ্য হয়েই তাকে ধনঞ্জয় কিংবা যদুর সঙ্গে ভাগে মজুর খাটতে হবে। ইলিশ মরসুমে সে যদি বেশি শ্রম না দিয়ে ঘরে বসে থাকে তাহলে অকালে সংসার নির্বাহ হবে কীভাবে? কুবের জানে, ইলিশের মরসুম ফুরালেই বিপুল পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়। নিজের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পদ্মা মাছগুলিকে লুকিয়ে ফেলে। নদীর মালিককে খাজনা দিয়ে হাজার টাকা দামের বিরাট জাল যারা ফেলতে পারে তারাই কেবল এ সময় বিশাল পদ্মার মাছ শিকার করতে পারে। কিন্তু ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থায় মাছ শিকারের সামান্য যে ভাগ পাওয়া যায় তাকে কুবেরের মতো দরিদ্র জেলের সংসার চালানো দুঃসাধ্য।

ইলিশের মরসুমে যে পদ্মা অকৃপণভাবে নিজের ভাণ্ডার জেলেদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, ইলিশের মরসুম শেষে সেই পদ্মাই কৃপণ হয়ে যায়, বিস্তৃত বুকে মাছগুলিকে লুকিয়ে রাখে। দরিদ্র জেলেরা ছোট জাল দিয়ে মাছের হৃদিস পায় না।

স্থলে মানুষের অবিরাম জীবন প্রবাহ।

উপস্থাপিত বাক্যটি বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের সংকলিত আখ্যান ভাগের অন্তর্গত। আলোচ্য বাক্যে প্রভাবে পদ্মার বুকে এবং পদ্মাতীরবর্তী মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহের মধ্যে যে সচলতা ও সজীবতা সে দিকে লেখক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

প্রভাবে পূর্বদিক যখন লাল হয়ে ওঠে সারারাত শিকার করে মেছো নৌকাগুলি তখন দেবীগঞ্জের ঘাটে এসে ভিড়ে। নদীর তীরে আর নদীর জলে জীবনের সাড়া জাগে। থেকে থেকে বেজে ওঠে স্টিমারের বাঁশি। স্টিমার ঘাট ছেড়ে যায়, কোনোটি জেটিতে এসে ভিড়ে। গঞ্জের সমস্ত দোকানপাট খুলে যায়। মানুষের কোলাহলে সরগরম হয়ে পড়ে চতুর্দিক। মেছো নৌকার ঘাটে দর কষাকষি করে মাছ বেচাকেনা চলে হরদম। মাছ চালানোর ব্যবস্থাও হয় সঙ্গে সঙ্গেই। জলে ও স্থলে এ-ভাবেই প্রবাহিত হয় মানুষের অবিরাম জীবন প্রবাহ।

নদীবক্ষে জেলে নৌকাগুলির অবিশ্রাম চলাচল আর নদীতীরবর্তী মানুষের গতিময় কর্মচাপল্য অবিরাম জীবন প্রবাহেরই ইঙ্গিতবহ। মানুষের জীবন প্রবাহ নদীর জলস্রোতের মতোই প্রবাহিত হয়ে চলে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- ◆ দেবীগঞ্জের হাটে মাছ কেনাবেচা ও চালানোর ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ মাছ চুরি করে কুবেরের প্রতারিত হওয়ার কাহিনী বলতে পারবেন।
- ◆ ধনঞ্জয়ের চাতুর্যের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ দরিদ্র ও বঞ্চিত কুবেরের দুঃখের কথা লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নেংটি – লেঙ্গটি-র কথ্যরূপ। কৌপিন। লজ্জা নিবারণের ক্ষুদ্রবাস।	নেংটি ছাড়িয়া তিনহাতি ছোট ময়লা কাপড়খানি পরিয়া কুবের তীরে উঠিল। কাদার মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার ও কাঠের টেবিল পাতিয়া চালানবাবু কেদারনাথ মাছ গোনা দেখিয়া খাতায় লিখিয়া যাইতেছে। একশ’ মাছ গোনা হইবামাত্র তার চাকরটা ছোঁ মারিয়া চালানবাবুর চাঁদা পাঁচটি মাছ মস্ত একটা কেরোসিন কাঠের বাস্কে ভরিয়া ফেলিতেছে। পাশেই কাঠের প্যাকিং কেসে একসারি মাছ ও এক পরত করিয়া বরফ বিছাইয়া চালানোর ব্যবস্থা হইতেছে। খানিক দূরে যেন লাইন হইতে গায়ের জোরে টানিয়া আনা একজোড়া উচুনিচু ও প্রায় একেজো লাইনের ওপর চার-পাঁচটা ওয়াগন দাঁড়াইয়া আছে। মাছের বোঝাই লইয়া যথাসময়ে ওয়াগনগুলি কলিকাতায় পৌঁছবে। সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।
চালানবাবু – যে কর্মচারি পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করেন।	একটা ওয়াগনের আড়ালে দাঁড়াইয়া লম্বা শার্ট গায়ে বেঁটে ও মোটা এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ হইতে কুবেরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। কুবের তাহার দিকে চাহিতেই সে হাতছানি দিয়া ডাকিল। কুবের খানিকক্ষণ নড়িল না। উদাসভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কাছে গিয়া বলিল, কী, কন? সে রাগ করিয়া বলিল, কী, কন! কী, জানস না? মাছ লইয়া আয়। তিনডা আনিস।
প্যাকিং কেস – এখানে যে বাস্কে চালানোর মাছ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।	
এক পরত – এক স্তর।	
চালান – রপ্তানি অর্থে।	
ওয়াগন – রেলের মাল গাড়ি।	
উদাসভাবে – নির্লিঙভাবে।	
তিনডা – তিনটা।	
সিদা – সোজাসুজি।	
আইজ – আজ।	
কয়ডা – কয়টা।	
তালি – তাহলে।	
নিরতিশয় – অত্যন্ত বেশি।	

অবসর – ফুরসৎ অর্থে।	মাছ ত নাই, শেতলবাবু।
দিমু – দেবো।	নাই কি রে, নাই? রোজ আমরাে মাছ দেওনের কথা না তর? নিয়ে আয় গা, যা।
রন – দাঁড়ান, অপেক্ষা করুন।	বড় দেইখা আনিস্।
তুরা – তাড়াছড়ো।	কুবের মাথা নাড়িল, আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর
খাওয়ামু – খাওয়ানো।	দিকে চাইয়া রইছে, দেখ না? বাজারে কেনো গা আইজ।
হালা – শালা, শ্যালক।	কিন্তু কুবের চুরি করিয়া যে দামে মাছ দেয়, বাজারে কিনিতে গেলে তার দ্বিগুণ
গলুই – নৌকার উভয় প্রান্তের সরু অংশ।	দাম পড়িবে। শীতল তাই হঠাৎ আশা ছাড়িতে পারিল না।
এলাইয়া – আলগা করে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে।	সে মিনতি করিয়া বলিল, তিনডা মাছ আইজ তুই দে, কুবের। অমন করস্
ভাগ – অংশ।	ক্যান? পয়সা না হয় কয়ডা বেশি লইস্, অ্যাঁই?
ফাউ – অতিরিক্ত, উপরি।	তাঁলি খানিক খাড়াও, শেতলবাবু। কুবের ফিরিয়া গিয়া, কাপড়টা ভাল করিয়া
ইটা – এটি।	গায়ে জড়াইয়া নৌকায় বসিল। চারিদিকে চেনা লোক কম নয়। চুপি চুপি মাছ
এক্কেরে – একেবারে।	লইয়া তাহাকে তীরে উঠিতে দেখিলে নিশ্চয় সন্দেহ করিবে। লজ্জার তাহার
জিগাইস – জিজ্ঞাসা করিস।	সীমা থাকিবে না। তবে একটা ভরসার কথা এ যে, সকলেই নিরতিশয় ব্যস্ত।
মিছা – মিথ্যা।	নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটো মাছ চুরি করিতেছে। তাকাইয়া দেখিবার
নিমীলন পিপাসু চোখে – বুজতে উনুখ চোখে।	অবসর কাহারো নাই। চারিদিকে নজর রাখিয়া তিনটা মাছ কুবের এক সময়
বঞ্চিত – প্রতারিত, ন্যায্য পাওনা যে পায়নি।	গায়ের কাপড়ের তলায় লুকাইয়া ফেলিল। তীরে উঠিয়া শীতলের হাতে দিতেই
অসঙ্কোচে – সঙ্কোচহীনভাবে।	মাছ কটা সে চটের থলির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।
উজান (উদ্যান>উজান) – শ্রোতের বিপরীত দিকে, জোয়ারে।	পয়সা কাইল দিমু, কুবের।
আঁজলা – অঞ্জলি পরিমাণ, করপুট পরিমাণ।	বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া বলিল, র'ন শেতলবাবু,
বাইবার – নৌকা বাওয়ার।	অমন তুরা কইরা যাইবেন না। দামটা দ্যান দেহি।
	কাইল দিমু, কইলাম যে?
	অঁই, অখন দ্যান। খামু না? পোলাগো খাওয়ামু না?
	পয়সা নাই ত দিমু কি? দিমু, নিষ্যাত দিমু।
	পিছল নরম মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল গাঁথিয়া গাঁথিয়া শীতল চলিয়া গেল।
	আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অক্ষুট স্বরে কুবের বলিল, হালা
	ডাকাইত! বিড়বিড় করিয়া শীতলকে আরও কয়টা গাল দিয়া কুবের নৌকায়
	গিয়া গলুইয়ের দিকে গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।
	গণেশটা বোকা। মাছের দাম বুঝিয়া পাওয়ার সময় একটু চেষ্টা করিয়াই ধনঞ্জয়
	তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিয়াছিল। একা একা দাম লইবার সুযোগ সে
	কোনদিনই প্রায় পায় না। কুবের এ সময়টা জোঁকের মতো তাহার সঙ্গে লাগিয়া
	থাকে। টাকা পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভাগটা বুঝিয়া লয়।
	ধনঞ্জয় নৌকায় আসিলে মাথা উঁচু করিয়া কুবের জিজ্ঞাসা করিল, কতটি মাছ
	হইল আজান খুড়া? শ চায়ের কম না, অ্যাঁ?
	ধনঞ্জয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল, হ, চাইর শ না হাজার।
	দুইশ সাতপঞ্চাশখানা মাছ। সাতটা ফাউ নিয়ে আড়াই শর দাম দিছে।
	কুবের উঠিয়া বসিল।
	ইটা কি কও, খুড়া? কাইল যে এক্কেরে মাছ পড়ে নাই, কাইল না দুই শ
	সাতাশটা মাছ হইছিল?
	ধনঞ্জয় তৎক্ষণৎ রাগ করিয়া বলিল, মিছা কইলাম নাকি রে কুবের? জিগাইস না,
	গণেশ আইলে জিগাইস।
	কুবের নরম হইয়া বলিল, জিগানের কাম কি? তা কই নাই, খুড়া। মিছা কওনের
	মানুষ তুমি না। মাছ নি কাল বেশি পড়ছিল, তাই ভাবলাম তোমারে বুঝি

	<p>চালানবাবু ঠকাইছে।</p> <p>ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ দুটি বুজিয়া আসিতে চায় আর সেই নিম্নলিখিত পিপাসু চোখে রাগে দুঃখে আসিতে চায় জল। গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।</p> <p>গণেশকে ধনঞ্জয় চিড়া কিনিতে পাঠাইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিলে নৌকা খুলিয়া দেয়া হইল। এখন বৈঠা না ধরিলেও চলে; উজান স্রোতের টানে নৌকা আপনি গ্রামের দিকে ভাসিয়া চলিবে। গণেশ ও ধনঞ্জয় গুড় মুখে দিয়া শুকনো চিড়া চিবাইতে লাগিল। কুবের কিছু খাইল না। কেবল কয়েক আঁজলা নদীর জল পান করিল। নদীর বুক জুড়িয়া এখন ভাঙা ঢেউগুলির মাথায় অসংখ্য সূর্য জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কাক-চিল-মাছরাঙা প্রভৃতি পাখিগুলি ক্রমাগত জ্বলে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট সংকেতের মতো একত্র স্টিমারের ধোঁয়া চোখে পড়ে। আকাশ উজ্জ্বল ও নির্মল। মেঘের চিহ্নও নাই।</p> <p>গণেশ সহসা মমতা বোধ করিয়া বলে, না আইলি পারতি কুবের আইজ। কুবের কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে থাকে।</p> <p>গণেশ বলে, মাথা টিপা দিমু নাকি?</p> <p>কুবের বলে, অই।</p> <p>গণেশ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলে, হাল ধইরা যদি যাইবার পারস কুবির, খুড়া আর আমি বৈঠা বাই, তাড়াতাড়ি পৌছান যায়।</p>
--	--

সার-সংক্ষেপ


নেংটি ছেড়ে তিনহাতি একখানা ময়লা কাপড় পরে কুবের তীরে ওঠে। চালানবাবু কেদারনাথ তখন খাতায় মাছের হিসাব লিখে মাছ চালানোর ব্যবস্থা করছেন। প্রতি একশ মাছ পিছু চাঁদা হিসেবে চালানবাবু বরাদ্দ পাঁচটি মাছ দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবে জমা করছে তার চাকর। মাছের প্যাকিং বস্ত্রগুলি চালান হয়ে যাবে কলকাতায়। কলকাতার মানুষ পদ্মার এ ইলিশ বাজার থেকে কিনে বাড়ি ফিরবে। কলকাতার বাতাসে পাওয়া যাবে পদ্মার ইলিশ মাছ বাজার গন্ধ।

কুবের সুযোগ পেলেই নৌকা থেকে মাছ তুলে লুকিয়ে বিক্রি করে। ধনঞ্জয় ন্যায্য পাওনা থেকে তাকে যেটুকু বঞ্চিত করে, এতে সেটা পুষিয়ে। দেবীগঞ্জ হাটের শেতলবাবু তার নিয়মিত খদ্দের। আজ শেতল বাবুকে কাছে মাছ বিক্রি করতে প্রথমে কুবের রাজি হয় না। ধরা পড়লে তার লজ্জার সীমা থাকবে না। তবে ভরসা এ যে, নিজের নৌকা থেকে কে কয়টা মাছ চুরি করছে তা দেখার অবসর কারও নেই।

গণেশ নির্বোধ প্রকৃতির মানুষ। কুবের যখন শেতলবাবুর কাছে মাছ বিক্রি করতে গিয়েছে, সেই সুযোগে নির্বোধ গণেশকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে ধনঞ্জয় মাছ গুণে গুণে বিক্রি করে দেয়। কুবের ফিরে এলে বলে মাছ বেশি ধরা পড়েনি গত রাতে। কুবের ধনঞ্জয়ের চালাকি বুঝতে পেরেও নৌকা ও জালের মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না।

ঘুমে ও শ্রান্তিতে কুবেরের চোখ বুজে আসতে চায়। রাগে-দুঃখে তার সে-চোখে জল আসতে চায়। কুবের জানে গরিবের মধ্যে আরো গরিব, ছোট লোকের মধ্যে আরো বেশি ছোট লোক। তার এ সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থানের জন্যই মানুষ তাকে প্রতারিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।
---	--

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন।

১. চালান বাবুর মাছ চালানোর ব্যবস্থা বর্ণনা দিন।
২. দেবীগঞ্জের হাট থেকে পদ্মার ইলিশ কোথায় যায়?
৩. কুবেরের মাছ চুরির এবং প্রতারণিত হওয়ার ঘটনা লিখুন।
৪. ধনঞ্জয় কোন্ কৌশলে গণেশ ও কুবেরের ন্যায় পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে?


প্রশ্ন : দেবীগঞ্জের হাট থেকে পদ্মার ইলিশ কোথায় যায়?

উত্তর : দিন-রাত পরিশ্রম করে পদ্মা নদীর মাঝিরা ইলিশ শিকার করে। সকাল-সন্ধ্যায় দেবীগঞ্জের মাছের হাটে দরকষাকষি করে মাছ কেনাবেচা হয়। মাছ চালানোর ব্যবস্থাও চলে সঙ্গে সঙ্গে। চালানবাবু কেদারনাথের তৎপরতায় প্যাকিং বাস্তব বরফ দিয়ে সাজানো হয় মাছ। ওয়াগন বোঝাই করে ইলিশের প্যাকিং বাস্তবগুলো ট্রেনযোগে কলকাতায় পৌঁছে। সকাল বিকাল কলকাতার বাজারগুলো পদ্মার ইলিশ কেনাবেচায় সরগরম হয়ে উঠে। কলকাতার নাগরিক বাজার থেকে পদ্মার ইলিশ কেনে বাড়ি ফেরে। ইলিশ মাছ বাজার স্বাদ-গন্ধে কলকাতার বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। জেলেদের কঠিন পরিশ্রমে ধরা পদ্মানদীর ইলিশ যুক্তিসঙ্গত দ্রুততায় কলকাতায় পৌঁছে পরিতৃপ্ত করে নাগরিক মানুষের রসনা।

প্রশ্ন : ধনঞ্জয় কোন্ কৌশলে গণেশ ও কুবেরের ন্যায় পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে?

উত্তর : ধনঞ্জয় কুবের ও গণেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃতভাবে ধনী। একটি ছোট জেলে নৌকা এবং একটি জালের মালিক সে। ধনঞ্জয়ের জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থাতেই কুবের ও গণেশের সামান্য উপার্জন হয়। নৌকা ও জালের মালিক হওয়ার সুবাদে ধনঞ্জয় সব সময় সুবিধা ভোগ করে। শারীরিক শ্রম কম দেয় সে। মাছ শিকারের পুরো সময়টাই সে নৌকার হাল ধরে বসে থাকে। উপকরণের মালিকানা স্বত্বের বদৌলতে মাছের অর্ধেক ভাগ পায় সে। সুযোগ পেলেই ধনঞ্জয় কুবের ও গণেশকে তাদের প্রাপ্য ভাগ থেকে ঠকায়। বর্তমান আখ্যান ভাগের ঘটনার দিনও ধনঞ্জয় কুবেরের সাময়িক অনুপস্থিতিতে নির্বোধ গণেশকে কাজের অছিলায় অন্য স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে অসম্ভব দ্রুততায় মাছ বিক্রি করে ফেলে। গতদিনের হাটে তারা মাছ বিক্রি করেছিলো দুশো সাতাশ টি। সেদিন বেশি মাছ ধরা পড়েনি বলে তাদের আপসোস ছিলো। অথচ ‘জবর’ মাছ ধরা পড়ার পরও আজ দুশো সাতান্নটি মাছ বিক্রি করার হিসেব দেয় ধনঞ্জয়। কুবের ধনঞ্জয়ের প্রতারণা বুঝতে পারে। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করে না। সে জানে প্রতিবাদ করার অধিকারটুকু থেকে সে বঞ্চিত।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।
---	---

১. সকালে বিকালে বাজারে বাজারে ইলিশ কিনিয়া কলিকাতার মানুষ ফিরিবে বাড়ি। কলিকাতার বাতাসে পাওয়া যাইবে পদ্মার ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।
২. নিজের নৌকা হইতে কে কোথায় দুটো মাছ চুরি করিতেছে তাকাইয়া দেখিবার অবসর কাহারো নাই।
৩. আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অক্ষুটস্বরে কুবের বলিল, ‘হালা ডাকাইত!’
৪. গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোট লোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক।
৫. এমনভাবে তাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে।

আরক্ত চোখে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া অক্ষুটস্বরে কুবের বলিল, ‘হালা ডাকাইত!’

ব্যাত্যেয় অংশটি কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’র সংকলিত আখ্যানভাগের অন্তর্গত। উদ্ধৃত বাক্যটি কুবেরের একটি সংলাপ।

ধনঞ্জয় নৌকা ও জালের মালিকানার সুবাদে উপার্জিত অর্থের অর্ধেক ভাগ পায়। ওপরন্তু সুযোগ পেলেই কুবের ও গণেশকে ঠকাতে সে পিছপা হয় না। দু-চারটি মাছ চুরি করে কুবের এ ক্ষতিটা কখনো কখনো পুষিয়ে নেয়। তার চুরি করা মাছের নিয়মিত খন্দের দেবীগঞ্জ হাটের শেতলবাবু। চুরির মাছের দাম স্বভাবতই কম। সুযোগসন্ধানী শেতলবাবু তাই কুবেরের খোঁজেই থাকেন।

গত রাতে অসুস্থ শরীর নিয়ে কুবের মাছ ধরেছে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে প্রভাতী হাটে মাছ বিক্রি করতে এসেছে তারা। এ-সময়েই আবির্ভাব ঘটে শেতলবাবুর। ইশারায় ডাকেন তিনি কুবেরকে। প্রথমে সে সাড়া না দিলে, বেশি মূল্য দেয়ার লোভ দেখান শেতলবাবু। কিন্তু ধনঞ্জয়কে ভয় কুবেরের। এছাড়া অসংখ্য মানুষের চলাচলে সরগরম পুরো হাট। তবু ভরসা এ যে, নিজের নৌকা থেকে কে কয়টি মাছ চুরি করল তা দেখার সময় নেই কারও। এ-ভরসাতেই শেষে প্রলুদ্ধ কুবের তিনটি ইলিশ কাপড়ের আড়াল করে শেতলবাবুর চটের থলিতে পুরে দেয়। কিন্তু ‘পয়সা কাইল দিমু কুবের’ বলে শেতলবাবু দ্রুত পা বাড়ান। নিজের এবং ছেলেদের ক্ষুধা মেটাতে হবে কুবেরকে। তাই অনুনয় করে সে মাছের মূল্য প্রার্থনা করে। কিন্তু আগামীকাল নিশ্চয় মূল্য পরিশোধ করবে এ কথা বলে পিছল মাটিতে পায়ের বুড়ো আঙুল টিপে টিপে শীতল চলে যায়। প্রতারিত হয়ে চাপা ক্ষোভে ফেটে পড়ে কুবের। কথ্য ভাষায় অক্ষুট স্বরে সে গালি দেয় ‘হালা ডাকাইত’।

বঞ্চিত হয়েও প্রতিবাদ করার অধিকারটুকু কুবেরের নেই। প্রতারিত হয়ে চাপা ক্ষোভে ফেটে পড়লেও অক্ষুট স্বরেই শিতলবাবুর উদ্দেশে গালি দিতে হয়েছে কুবেরকে। কুবেরের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণেই শেতলবাবুকে সরাসরি মোকাবেলা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত কুবের।

এমনভাবে তাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে।

আলোচ্য অংশটুকু উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে গৃহীত হয়েছে। উদ্ধৃত অংশে ধনঞ্জয় কর্তৃক প্রতারিত কুবেরের আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে।

কুবের অতি দরিদ্র জেলে। তার নিজের নৌকা নেই, জাল নেই। ধনঞ্জয়ের জেলে নৌকা ও জাল ব্যবহার করে কুবের ভাগে মাছ ধরে। নৌকা ও জালের মালিক হওয়ার সুবাদে শিকার করা মাছের অর্ধেক ভাগ নেয় ধনঞ্জয়। বাকি অর্ধেক দুভাগ করে নেয় কুবের ও গণেশ। ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। অধিকাংশ সময়ই সে হাল ধরে বসে থাকে, জাল ফেলা আর তোলার কাজটি করে কুবের ও গণেশ। বাড়তি উপার্জন সত্ত্বেও ধনঞ্জয় সুযোগ পেলেই কুবের ও গণেশকে ঠকায়।

গত রাতে ‘জবর’ ইলিশ ধরা পড়েছে জেলেদের জালে। কুবের ও গণেশও ধরেছে প্রচুর ইলিশ। সকালে দেবীগঞ্জের মাছের হাটে চালান বাবুর কাছে মাছ বিক্রি করতে এসেছে তারা। কুবের তিনটি ইলিশ চুরি করে শেতলবাবুর কাছে বিক্রি করতে গেলে ধনঞ্জয় কুবেরের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে। নির্বোধ গণেশকে কাজের অছিলায় অন্যত্র পঠিয়ে দিয়ে দুশো সাতাশটি মাছ বিক্রি হয়েছে। কুবের মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। গত রাতের আগের রাতে

মাছের আকাল ছিলো পদ্মায়। সে রাতেও তারা দুশো সাতাশটি মাছ ধরেছিলো। কুবের ধনঞ্জয়ের কৌশল ও প্রতারণা বুঝতে পারে। কুবের জানে যে 'গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক'। কাজেই বঞ্চিত প্রতারিত হয়ে প্রতিবাদ করার অধিকার তার নেই। পক্ষান্তরে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার সকলে সামাজিক প্রথা এবং ধর্ম সম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতোই অবলীলায় প্রয়োগ করে।

প্রথা কিংবা নিয়ম মনে করেই দরিদ্রকে বঞ্চিত করে। দারিদ্র্যের কারণেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কুবেরের মতো দরিদ্র মৎস্যজীবীরা প্রতারণার শিকার হয়েও মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারে না।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- ◆ কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়ার পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ জেলেপাড়ার মানুষের জীবন বাস্তবতার কথা লিখতে পারবেন।
- ◆ জেলেপাড়ার মানুষের জীবনে পদ্মানদীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ◆ নিজের ভাষায় পদ্মার রূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
জমাট – এক স্থানে আবদ্ধ।	পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতের নাই, তবু মাথা গুঁজিবার ঠাই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিবার বাড়িতে পায় না; একটি কুঁড়ে আনাচে কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।
অনাবশ্যক – আবশ্যক নয় যা।	দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুক জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আঁধার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এ-দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেঘারেঘি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদের, তালের রস গঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অনু পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।
সঙ্কীর্ণতা – অপ্রশস্ততা।	পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুক,
উন্মুক্ত – খোলা, অবরোধমুক্ত।	
প্রবঞ্চনা – প্রতারণা।	
ভূস্বামী – জমির মালিক, জমিদার।	
কুঁড়ে – কুঁড়েঘর।	
পুরুষানুক্রমে – বংশক্রমে।	
প্রথা – সামাজিক নিয়ম।	
ঋতুচক্রে – ঋতুর আবর্তন।	
পাক খায় – আবর্তিত হয়।	
ক্ষুধাতৃষ্ণার ... দেবতা – দেবতা, যাঁদের পূজা দিয়ে তুষ্ট রাখতে হয় দরিদ্র অসহায় মানুষদের।	
ব্রাহ্মণ – হিন্দু বর্ণাশ্রম সমাজের উচ্চতম শ্রেণী।	


<p>ব্রাহ্মণেতর – ব্রাহ্মণের চেয়ে নিম্নতর কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর।</p> <p>রেষারেষি – পরস্পর হিংসা।</p> <p>কাড়াকাড়ি – পরস্পর টানাটানি।</p> <p>হয়রান (আ.) – ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।</p> <p>অভ্যর্থনা – (সং অভি+অর্থ+অন+আ) সম্ভাষণ, সংবর্ধনা।</p> <p>নিরুৎসব – উৎসবহীন, অনাড়ম্বর।</p> <p>কাম – যৌন সম্বোধন।</p> <p>উপজীবিকা – জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায়।</p> <p>কুঁড়োজাল – মাছ ধরার ছোট জাল।</p> <p>উঠান – প্রাঙ্গণ, অঙ্গিনা।</p> <p>সম্বল – অবলম্বন।</p> <p>রিজ্ততা – শূন্যতা।</p> <p>আল – জমির সীমা নির্দেশক বাঁধ, উঁচুপথ।</p> <p>গ্রামান্তর – অন্যগ্রাম।</p> <p>বিরাম – বিশ্রাম।</p> <p>পদ্মার মাটির বুক – পদ্মানদীর তলদেশ।</p> <p>কুটুমবাড়ি – অীশ্ববাড়ি।</p>	<p>কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ-গাঁয়ের মানুষকে ও-গাঁয়ে পৌছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ। বর্ষাকালে চারিদিক জল জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এ সময়ে মানুষের বাড়ি ঘর আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল যেবার বেশি হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সেবার রেহাই পায় না। পথঘাটের চিহ্নও থাকে না। একই গ্রামে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়ায় যাইতে প্রয়োজন হয় নৌকার। কয়েকদিন পরে জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উকি দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু আরও একমাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না। যানবাহন এদেশের একরকম নাই। মানুষের সম্বল নৌকা। উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।</p> <p>নৌকার প্রয়োজন কমে সেই শীতের শেষে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। খালে তখন জল থাকে না, মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা ফসল কাটা রিজ্ততা। মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়।</p> <p>নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনো শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, তা কে জানে। সমুদ্রগামী জল-প্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।</p> <p>জেলেপাড়া নদী হইতে বেশি দূরে নয়। তবু এটুকু পথ চলিতেই কুবেরের কষ্ট হইতেছিল। নৌকায় সমস্ত পথটা আবোল তাবোল বকিয়া গণেশ এতক্ষণে চুপ করিয়াছে। ধনঞ্জয় নৌকা হইতে নামে নাই। পাশে কুটুমবাড়িতে তাহার কী প্রয়োজন ছিল। নৌকা লইয়া সে একা সেখানে চলিয়া গিয়াছে।</p> <p>গণেশের বাড়িটাই পড়ে আগে। সে বাড়িতে ঢুকিল না। অসুস্থ কুবেরের সঙ্গে আগাইয়া চলিল।</p>
---	--

সার-সংক্ষেপ

কেতুপুর গ্রামের বাইরে পূর্বপ্রান্তে জেলেপাড়া। চারদিকে ফাঁকা জমির অভাব না-থাকলেও জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে জমাট বেঁধে গড়ে উঠেছে। প্রথম দেখলে মনে হয় এ-বুঝি তাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই অনুভব করা যায় প্রকৃত সত্য। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামী বা জমিদারের অধিকার প্রসারিত। অপেক্ষাকৃত কম খাজনার জমি অতিক্রম করে জেলেপাড়ার পরিসর তাই বাড়তে পারে না। দিন কাটে, জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুর পর ঋতু আসে, প্রমত্তা পদ্মার এক তীর ভাঙে, অন্য তীরে জাগিয়ে তোলে সুবিশাল চর। সময়ের এ আবর্তনের মধ্যেই সচল থাকে জেলেপাড়ার জীবন। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে বর্ষার জল প্রবেশ করে, কনকনে ‘শীতের আঘাত’ হাড়ে গিয়ে বাজে। এদের জীবনে আসে রোগ, আসে শোক। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তারা ক্লান্ত হয়। জন্মধারা এখানে সচল কিন্তু জন্মের অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণ এখানে উৎসব আড়ম্বরহীন জীবনের স্বাদ বা অর্থ তাদের জীবন ক্ষুধার নিবৃত্তি, যৌন সম্বোধন ও স্বার্থরক্ষার সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ। জেলে পাড়ায় ঈশ্বর অবস্থান করেন না। তিনি থাকেন ভেতর গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে।

পদ্মা এবং পদ্মার খালগুলি জেলেপাড়ার অধিকাংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন। কেউ মাছ ধরে, কেউবা মাঝিগিরি করে। কেউ ক্ষুদ্র জাল নিয়ে খালে-খালে দিন কাটায়, কেউবা কুবেরের মতো জাল ফেলে বেড়ায় পদ্মার বিশাল বুকে। স্রোতস্থিনী পদ্মা যেমন কখনো শুকায় না, তার বুকে নৌকার চলাচলও তেমনি কখনো থামে না। আজও পদ্মার সমুদ্র অভিমুখী স্রোতধারার মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। জলে ঢাকা পদ্মার তলদেশের মাটির বুকে কেউ কখনো দেখেনি, সে বুক চিরকাল ধরে গোপন হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।
---	--

- জেলেপাড়ার পরিবেশ বর্ণনা করুন।
- ‘জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না’। কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
- জেলেপাড়ার জীবনধারার পরিচয় নিজের ভাষায় লিখুন।
- পদ্মা কীভাবে জেলেপাড়ার অধিকাংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।
- জেলেপাড়ার মানুষের জীবিকা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিচয় দিন।

প্রশ্ন : জেলেপাড়ার পরিবেশ বর্ণনা করুন।

উত্তর : পূর্বপ্রান্তে, গ্রামের বাইরে জেলেপাড়ার অবস্থান। এ পাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে জমাট বেঁধে গড়ে উঠেছে। চারপাশের প্রচুর সমতল ফাঁকা ভূমিতে ভূস্বামীর একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু বেশি খাজনার ঐ জমিতে জেলেপাড়া প্রসারিত হওয়ার সুযোগ নেই। কম খাজনার জমিতে একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে অন্য কুঁড়ে গড়ে ওঠে।

জেলেপাড়ার জীবনও একঘেয়ে। ভেতর গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র সমাজ তাদের দূরে ঠেলে রাখে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিপর্যস্ত করে তোলে তাদের জীবনধারা। তবু বংশবিস্তার কখনও এখানে বন্ধ হয় না। যদিও জেলেপাড়ায় জন্মের সংবর্ধনা উৎসবহীনতায় বিষণ্ণ।

বর্ষার জেলেপাড়ায় জল উঠান পর্যন্ত ওঠে আসে। নৌকা তখন যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম।

প্রশ্ন : ‘জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না’। কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বংশানুক্রমে কম খাজনার নির্দিষ্ট ভূমিতে অসংখ্য জমাট বাঁধা কুঁড়ে ঘরে বাস করে জেলেপাড়ার মানুষ। মূল গ্রামের বাইরে এ অদৃশ্য মানুষদের পাড়া। গ্রামের ভেতরে ভদ্রপল্লী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র সমাজের বসবাস সেখানে।

মানুষ কর্তৃক শোষিত ও বঞ্চিত এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত তবু জেলেপাড়ার জীবনধারা থেমে থাকে না। অস্তিত্ব তবুমান এসব মানুষ যুগ যুগ ধরে শত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নিজেদের অস্তিত্বকে সচল রেখেছে। তবে জীবনের আনন্দ উৎস এখানে ভিন্ন। ক্ষুণ্ণবৃত্তিতে, যৌনসম্বোধে, মায়া মমতায় এবং সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় এরা সন্ধান পায় জীবনের স্বাদ। জীবন থেমে থাকে না বলেই জেলেপাড়ায় শিশুর ক্রন্দন কখনো থামে না। নবজাতকের ক্রন্দনে জীবনের প্রবহমানতা এখানে সংকেতিত হয় প্রতিনিয়ত। তবে অভাব-অনটনের কারণেই জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, আড়ম্বরহীনতায় বিষণ্ণ।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না।
২. জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না।
৩. জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ।
৪. জীবনের স্বাদ এখানে ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়।
৫. ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।
৬. নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনো শুকায় না।

ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

উদ্ধৃত অংশটুকু কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’র সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে গৃহীত হয়েছে। আলোচ্য অংশে ঔপন্যাসিক জেলেপাড়ার বঞ্চিত মানুষের জীবন, ঈশ্বরের অনুদারতা ও পক্ষপাতিত্বের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করেছেন।

কেতুপুর গ্রামের একপ্রান্তে, গ্রামের বাইরে অস্পৃশ্য মানুষ জেলেদের পাড়া। জেলেপাড়ার প্রসারিত হওয়ার সুযোগ নেই, পুরুষানুক্রমে এরা সুনির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ। মূল গ্রামে বসবাস করেন ভদ্রশ্রেণী, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর ভদ্রসমাজের তারা অংশ। ভদ্রপল্লীর মানুষ অচ্ছুৎজ্ঞানে জেলেদের দূরে ঠেলে রাখে। জেলেরা একদিকে মানুষের দ্বারা বঞ্চিত প্রতারিত হয়, অন্যদিকে বিপর্যস্ত হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে। কালবৈশাখীর ঝড় সংহারমূর্তিতে আবির্ভূত হয় এদের জীবনে, শীতের আঘাত’ এদের হাড়ে গিয়ে বাজে। রোগ-শোক এসে বিপন্ন করে তোলে এদের অস্তিত্ব। কিন্তু বংশধারার বিস্তার এখানে থামে না। জীবনের আনন্দ এরা খুঁজে পায় ক্ষুধার নিবৃত্তিতে, যৌনসম্মোগে, মায়ামমতায় আর পরস্পর রেষারেষিতে। তালের রস, ও ক্ষুধার অনু পচিয়ে যে মদ তৈরি হয় সে মদ তাদের জীবনানন্দের অন্যতম উপকরণ-উৎস। জেলেদের গৎবাঁধা রোগ শোক বিপর্যস্ত জীবনে উদার ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেই। ঈশ্বর অবস্থান করেন ভদ্রপল্লীতে। স্বচ্ছল ভদ্রসমাজেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, ধনীরাই দখল করে রাখে ঈশ্বরকে - এ মনোভাবই তীব্র শ্লেষ মিশ্রিত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য অংশে।

সবদিক থেকে যে মার খায়, ঈশ্বরও তাকে বঞ্চিত করেন। জেলেপাড়ার সংকীর্ণ দুঃখপীড়িত জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর অবস্থান করেন ভদ্র পল্লীতে সুখ সমারোহে তিনি সমুপস্থিত।


নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনো শুকায় না।

উদ্ধৃত অংশটুকু ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে চয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য অংশে ঔপন্যাসিক চিরযৌবনা পদ্মানদীর আবহমান গতিধারার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এ-উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিরযৌবনা প্রমত্তা পদ্মার রূপ অঙ্কন করেছেন। নৌকা পদ্মার ভূষণ। এ-নদী কখনো শুকায় না বলেই পদ্মায় নৌকা চলে সর্বদা। পদ্মার স্রোতধারার অনুষ্ণে চলমান নৌকার গতিভঙ্গি নদীর সামগ্রিক প্রবহমানতাকেই মূর্ত করে তোলে।

অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জেনেছে চিরযৌবনা পদ্মা কখনো শুকায় না। কে জানে কবে এ-নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এ-নদী শুধু চলতেই জানে— সমুদ্রমুখী যাত্রায় তার মুহূর্তের বিশ্রাম নেই। জলে ঢাকা পদ্মার তলদেশের মাটির বুক সমকালীন মানুষের কাছে গোপন হয়ে আছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।
---	--

১. ‘পদ্মানদীর মাঝি’ আখ্যানভাগের অনুসরণে জেলেদের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।
২. ‘পদ্মানদীর মাঝি’ অবলম্বনে কেতুপুর গ্রামের জেলেদের জীবনচিত্র অঙ্কন করুন।
৩. ইলিশমাছ ধরার মরসুমে পদ্মার পরিবেশ বর্ণনা করে মাছ ধরার কৌশল ও মাছ কেনাবেচার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
৪. ‘জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়’। –জেলেপাড়ার মানুষের জীবনবোধ সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ-মন্তব্যের তাৎপর্য বিচার করুন।
৫. ‘পদ্মানদীর মাঝি’ আখ্যানভাগের অনুসরণে কুবেরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

প্রশ্ন : ‘পদ্মানদীর মাঝি’ আখ্যানভাগের অনুসরণে জেলেদের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ নামে সংকলিত বর্তমান আখ্যানভাগে পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। কেতুপুর গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকা, অভাব অনটন, সুখ-দুঃখ, বঞ্চনা-বিপর্যয় এবং পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বাস্তববাদী শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

জীবনকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার সামর্থ্য এবং জীবনের সত্যকে অবিকৃত রেখে শৈল্পিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই বাস্তববাদী সাহিত্যের সাফল্য নির্ভরশীল ও পদ্মাতীরবর্তী মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে যে অভিজ্ঞতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্জন করেছিলেন, ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে তারই শিল্পিত প্রতিফলন ঘটেছে।

কেতুপুর গ্রামের বাইরে পূর্বপ্রান্তে জেলেপাড়ার অবস্থান। জেলেপাড়ার অধিকাংশ মানুষই মৎস্যজীবী। পদ্মা এদের উপজীবিকার অবলম্বন। জলে ঝড়ে পদ্মায় নৌকা ভাসিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে এরা মাছ শিকার করে। ইলিশের মরসুম ফুরালে বিপুল পদ্মা কৃপণ হয়ে যায়। ফলে পদ্মা হয়ে উঠেছে এদের জীবনেরই এক অনিবার্য অংশ। বর্ষাকালে পদ্মা গ্রামের দিকে এগিয়ে আসে। তখন চারদিকে জলে জলময় হয়ে যায়। পথ ঘাটের চিহ্নও থাকে না তখন চৈত্রে যখন পথঘাট শুকায় তখন পথে হেঁটে মানুষ গ্রামান্তরে যায়। কিন্তু নৌকা চলে পদ্মায় সব সময়। পদ্মা কখনো শুকায় না, সমুদ্রমুখী চলার তার বিরাম নেই। পদ্মার বয়ে চলার মতোই সুখে-দুখে, রোগে শোকে, আনন্দ-বেদনায় জেলেপাড়ার মানুষের জীবনও পুরুষানুক্রমে অতিবাহিত হয়ে চলেছে।

জেলেপাড়ার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ ধনঞ্জয় কুবের গণেশ। এরা তিনজনই দরিদ্র। কিন্তু এদের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্যের মাত্রাগত তারতম্য। ধনঞ্জয় অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, তার রয়েছে নিজের নৌকা ও জাল। কুবের ও গণেশ ধনঞ্জয়ের নৌকা ও জাল ব্যবহার করে ভাগে ইলিশ শিকার করে পদ্মায়। মালিকানা স্বত্বের কারণেই ধনঞ্জয় পরিশ্রম করে কম। ওপরন্তু সুযোগ পেলেই সে ঠকায় কুবের ও গণেশকে। চোরাই মাছের ক্রেতা যে শেতলবাবু, তিনিও সুযোগ বুঝে প্রতারণা করেন এ দরিদ্র জেলেদের সঙ্গে। দেবীগঞ্জ হাটের মাছ বাজারের চালানবাবুও বখরা আদায় করেন এ শ্রমজীবী নিঃস্ব জেলেদের উপার্জনের অংশ থেকে। এভাবেই বঞ্চিত প্রতারিত হয়ে চলে এসব দরিদ্র জেলের জীবন। সগোত্রীয় ধনঞ্জয় কর্তৃক প্রতারিত হয়ে কুবের এ অনুভবে উপনীত হয়েছিলো যে “গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক, এমনভাবে তাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।”

কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়ায় একান্তভাবে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ই কেবল বাস করে। এদের কেউ মাছ ধরে, কেউ করে মাঝিগিরি। এ-পাড়ার চারদিকে ফাঁকা জমির অভাব না-থাকলেও গায়ে-গায়ে জমাট বেঁধে গড়ে উঠেছে এদের কুঁড়েঘর। জমাট বাঁধা এ কুঁড়েঘরগুলি দেখে প্রথমে মনে হয় এ-বুঝি এদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু

আসলে বেশি খাজনার পার্শ্ববর্তী জমি ভূ-স্বামীর অধিকারভুক্ত। এজন্যই জেলেপাড়ার পরিসর তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারে না। বংশানুক্রমে একটি কুঁড়ের আনাচে কানাচে অন্য কুঁড়ে গড়ে ওঠে। গ্রামের বাইরের এ জেলেপাড়ার মানুষকে গ্রামের ভেতরকার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রসমাজ দূরে ঠেলে রাখে। অন্যদিকে বিরূপ প্রকৃতি সংহার মূর্তি আবির্ভূত হয় এদের জীবনে। একদিকে মানুষের দ্বারা তারা বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়, অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় লণ্ডভণ্ড করে দেয় এদের গোছানো সংসার। বর্ষার ঘরে ঘরে জল প্রবেশ করে, শীতে কনকনে ঠাণ্ডার ‘আঘাত’ এদের হাড়ে এসে বাজে। আসে রোগ শোক। অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনেই জেলেপাড়ার মানুষ কখনো পরস্পর সংঘাতেও লিপ্ত হয়। তবু বংশধারার বিস্তার এখানে থামে না কখনো। এদের কাছে জীবন হলো – ক্ষুধার নিবৃত্তিতে, যৌনসম্মোহে, মায়ামমতায়, রেষারেষিতে। তালের রস গাঁজিয়ে বা ক্ষুধার অনু পচিয়ে তৈরি মদ এদের আনন্দের অন্যতম এক উৎস।

দুঃখ-সুখ, রোগ শোক, বঞ্চনা-প্রতারণা মিলেই জেলেপাড়ার জীবনধারা প্রবহমান। জেলেপাড়ায় নবজাতক শিশুর অভ্যর্থনা ‘গঙ্গীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ’ হলেও “জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না।” নবজাত শিশুর ক্রন্দনে জীবনের প্রবহমান ধারা এখানে সংকেতিত হয় প্রতিনিয়ত। বঞ্চিত ও বিপর্যস্ত গঁৎবাঁধা জীবনে বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা থাকলেও উদার ঈশ্বরের আর্শীবাদ জেলেপাড়ার জীবনে বর্ষিত হয় না। এ জীবনে ক্ষুধার অনু মদে পরিণত হয়, উপার্জিত অর্থ সুযোগ সন্ধানীর প্রতারণায় হাতছাড়া হয়ে যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাই এ-পাড়ায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর অবস্থান করেন ভদ্রপল্লীতে। ধনীরাই দখল করে রাখে ঈশ্বরকে, তাদের ওপরই বর্ষিত হয় তাঁর অপার করুণা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই পদ্মাতীরবর্তী মৎস্যজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক, আনন্দ-বেদনার স্বরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যে উপস্থাপন করেছেন।

সংকলিত আখ্যান ভাগে বাস্তববাদী শিল্পীর তুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের রুঢ় জীবন- বাস্তবতা ও নিয়তি।

প্রশ্ন : ‘পদ্মানদীর মাঝি’ আখ্যানভাগের অনুসরণে কুবেরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

উত্তর : কথাসিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’র কেন্দ্রীয় চরিত্র কুবের। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ শিরোনামে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত আখ্যানভাগে পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনযাত্রার পটভূমিতে কুবের মাঝির যে পরিচয় প্রকাশিত, তা থেকে সহজেই কুবের চরিত্রের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে নেয়া যায়। কুবের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অসামান্য সৃষ্টি। নিয়তিতাড়িত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিপর্যস্ত এবং মানুষ কর্তৃক বঞ্চিত-প্রতারিত সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই কুবের চরিত্রের সার্থকতা।

পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের একপ্রান্তে অবস্থিত জেলেপাড়ার এক দরিদ্র মৎস্যজীবী কুবের মাঝি। পদ্মা তার জীবন-জীবিকার অবলম্বন। দরিদ্র কুবেরের জাল নেই, নৌকা নেই। নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয় কিংবা যদুর সঙ্গে ভাগে পদ্মায় মাছ শিকার করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। জেলেপাড়ার মানুষ সকলেই দরিদ্র, তবে তাদের দারিদ্র্যের মধ্যেও রয়েছে তারতম্য। যেমন ধনঞ্জয় নৌকা ও জালের মালিকানার সুবাদে বেশি অর্থ আয় করে। পরিশ্রমও করে সে কম। ওপরন্তু সুযোগ পেলেই সে সহজীবীদের ঠকাতে পিছপা হয় না। সারারাত ‘জবর’ মাছ ধরেও ধনঞ্জয়ের কূটকৌশলে যখন কুবের প্রতারিত হয় প্রকৃত প্রাপ্য থেকে তখন সে প্রতিবাদ করতে পারে না। দারিদ্র্যের শেকলে আবদ্ধ কুবের মাঝি। প্রতিবাদ তার নিরাপদ জীবিকা উৎসের পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে বলেই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, নৌকা ও জালের মালিক ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না কুবের। তবে ঠকে ঠকে সেও শিখে নিয়েছে প্রাপ্য আদায়ের অসৎ কৌশল। কুবের জানে—

“গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারটা সকলে তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো, অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার অধিকার তাহার নাই।”


এ-কারণেই নিজেদের ধরা ইলিশ থেকেই দু’দিনটা লুকিয়ে গিয়ে প্রায়শ বিক্রি করে কুবের। চোরাই মাছের দাম যেহেতু কম, সেহেতু ঐ মাছ কেনার সুযোগ গ্রহণ করে দেবীগঞ্জ হাটের শেতলবাবু। সুযোগসন্ধানী শেতলবাবুও সুযোগ বুঝে কুবেরকে ঠকাতে পিছপা হয় না। এভাবে দুদিক থেকেই প্রতারিত হয় কুবের। জীবনের নিয়তিই বঞ্চিত করে রেখেছে কুবেরকে। নিয়তির এ অনুশাসন অমান্য করা যায় না, মেনে নিতে হয়।

কুবের নিরলস কর্মোদ্যোগী মৎস্যজীবী। জীবনও জীবিকার প্রয়োজনে, সন্তানদের ক্ষুধার অন্তর স্বার্থে অসুস্থ শরীর নিয়েও সে ইলিশ শিকারে অংশগ্রহণ করে। শান্তিতে অবসন্ন হয়েও কুবের কাজে ফাঁকি দেয় না। কুবের জানে ইলিশের মরসুম শেষে বিপুল পদ্মা কৃপণ হয়ে যাবে। পদ্মা তার বিশাল বক্ষে মাছগুলিকে লুকিয়ে ফেলবে, ধনঞ্জয় ও যদুর জোড়াতালি দেয়া ব্যবস্থায় তখন মাছ ধরার সুযোগ থাকবে না। এজন্যেই ভরা মরসুমে বেশি পরিশ্রম করে ভবিষ্যৎ আকালের রসদ সে সংগ্রহ করে রাখতে চায়। তার এ প্রত্যাশা ও প্রয়াসের মধ্যে পরিণামদর্শিতা আছে কিন্তু জীবনের বাস্তবতাই কুবের-এর নিরাপদ ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করে রাখে। কেননা গরিব সে, মার খাওয়া আর প্রতারিত হওয়াই তার জীবনের পুরুষানুক্রমিক নিয়তি।

কুবের যে জেলেপাড়ার অধিবাসী সেখানে জীবনধারা অত্যন্ত সংকীর্ণ। নবজাতকের কান্না প্রতিনিয়ত জেলেপাড়ার জীবনের সচলতাকে অক্ষুণ্ণ রাখলেও জন্মের অভ্যর্থনা সেখানে আড়ম্বরহীনতায় বিষণ্ণ। এ জেলেপাড়ারই মানুষ কুবের। এখানে রোগ শোক জীবনের নিত্য সহজর। যৌন সম্মোগে, মমতায়, পরস্পর রেষারেষিতে এবং তালের রস গাঁজিয়ে এবং ক্ষুধার অনু পচিয়ে তৈরি মদ, এখানকার মানুষের জীবনে আনন্দের উৎস। কুবের মাঝি এ জীবন ধারার অংশিদার। জেলেপাড়ার এ জীবনবোধেরই ধারক ও বাহক সে।

কুবের সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি। নিয়তির অমোঘ বিধানে জন্মেই যাদের গঁৎবাঁধা ভাগ্য চিহ্নিত হয়ে যায় – নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কন করেছেন কুবের চরিত্র। কুবের অভ্যাস ও নিয়মের দাস, শাসন- অনুশাসনে বন্দী। সর্বোপরি অন্তরে বিক্ষোভ লালন করেও সে প্রতিবাদ প্রকাশে অসমর্থ। অচ্ছুৎ বলে সামাজিক জীবনে তার স্বীকৃতি নেই, বিপর্যস্ত বঞ্চিত জীবনে নিরাপত্তাও নেই। সর্বোপরি, তার জীবনে নেই ঈশ্বরের উদার আর্শীবাদ। সবদিক থেকে মার খাওয়া কুবেরের জীবনের একমাত্র অবলম্বন পদ্মা তার জবিন জীবিকার উৎস। মাটির মানুষের সঙ্গে নদীর জলের এক নিবিড় সম্পর্ক উদ্ভাসনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুবের মাঝি চরিত্রকে চিরায়ত মহিমা দান করেছেন।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।
---	---

উপভাষা : অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষাকে বলা হয় উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষের সংলাপে ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে আঞ্চলিক ভাষার কয়েকটি সংলাপ এবং সেগুলির বাংলা প্রমিত রূপ উপস্থাপন করা হলো :

আঞ্চলিক ভাষা :

‘যদু হে এ এ এ – মাছ কিবা?’

‘জবর’।

‘সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের।’

‘কাইল চাইরে নামব। হালায় মাছ ধইরা জুত নাই।’

প্রমিত রূপ

‘ওহে যদু – মাছ কেমন ধরা পড়েছে?’

‘সন্ধ্যার দরটা (মাছের) জিজ্ঞেস কর দেখি কুবের।’

‘কাল চারে (টাকায়) নামবে। শালার মাছ ধরে সুখ নেই।’

সমাস

একাধিক শব্দ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ তৈরি করাকে বলা হয় সমাস। সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে দুটি সমাসবদ্ধ পদ নিম্নে উপস্থাপিত হলো -

দা-কাটা – দা দ্বারা কাটা। এটি তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

কাদায় পোঁতা – কাদাতে পোঁতা। এটি সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।

তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পেয়ে এ ধরনের সমাসবদ্ধ পদ গঠিত হয়।

প্রতিশব্দ

যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে অথবা যে সব শব্দকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায়, তাদের বলা হয় প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ। বর্তমান আখ্যানভাগ থেকে কিছু শব্দ এবং সেগুলির কিছু প্রতিশব্দ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

মূল শব্দ	প্রতিশব্দ/সমার্থক
অনির্বাণ	জ্বলন্ত, প্রজ্বলিত, বহিমান, অগ্নিমান ইত্যাদি।
চাঁদ	চন্দ্র, ইন্দু, শশী, শশাঙ্ক, নিশাপতি, শশধর ইত্যাদি।
বিন্দ্র	অনিদ্র, নিদ্রাহীন, নিদ্রাহারা, ঘুমহীন, জাগ্রত, জাগরুক ইত্যাদি।
সৌভাগ্য	ভাগ্যগুণ, ভাগ্যবর, জোরকপাল, বরকত ইত্যাদি।
নিরীহ	অবিরোধী, নির্বিরোধ, নির্বিবাদী, গোবেচারী ইত্যাদি।

সৃজনশীল কাজের পরামর্শ

- ◇ সংকলিত আখ্যানভাগ থেকে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা সংলাপগুলি আলাদা করে প্রমিত বাংলায় রূপান্তর করুন।
- ◇ চারটি পাঠ থেকে চারটি শব্দ বাছাই করে শব্দগুলি বিপরীতার্থক রূপ উপস্থাপন করুন।
- ◇ নিজের মাছ ধরার অথবা মাছ-শিকার দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন-

‘পদ্মানদীর মাঝি’ পুরো উপন্যাসটি পড়ুন। হাতের কাছে পেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ ও অন্যান্য উপন্যাস পড়ুন।

সূর্য গ্রহণ

জহির রায়হান

লেখক পরিচিতি

১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট ফেনী জেলার অন্তর্গত মজুপুর গ্রামে জহির রায়হান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। জহির রায়হানের পিতার নাম মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং মাতা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন।

জহির রায়হানের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয় কলকাতায়। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতা মডেল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর জহির রায়হান তাঁর পিতার সঙ্গে মজুপুর গ্রামে চলে আসেন এবং স্থানীয় আমিরাবাদ হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫০ সালে তিনি একই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি আই.এস.সি পাস করেন। অতঃপর পিতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভাগ পরিবর্তন করে ১৯৫৮ সালে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়ে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম.এ ক্লাসে ভর্তি হলেও নানা কারণে চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি অবতীর্ণ হননি।

জহির রায়হানের জীবনকে আমরা চারটি প্রধান ধারায় বিন্যস্ত করতে পারি। এ ধারাগুলো হলো সাহিত্যজীবন, সাংবাদিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন এবং চলচ্চিত্র জীবন। বস্তুত, তাঁর কাছে এ চারটি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ফলে একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন করা প্রায় দুর্লভ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি কবিতা, নাম “ওদের জানিয়ে দাও”। ১৯৪৯ সালে কবিতাটি ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জহির রায়হান সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে কিশোরজীবন থেকেই জড়িত হন। অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রেরণায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৭ সালের পর থেকে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকলেও, বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে তার যোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির নানা কাজেও তিনি কখনো কখনো অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও তিনি অবিস্মরণীয় কৃতির স্বাক্ষর রেখে যান। মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে তাঁর ছবি ‘স্টপ জেনোসাইড’ সমগ্র পৃথিবীজুড়ে বিপুল সাড়া জাগায়। এ-ছাড়াও তিনি আরো অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

কথাসাহিত্যিক হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্যের ধারায় তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রগতিশীল মানবতাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনাই তাঁর সাহিত্যকর্মের মৌল বিষয়। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত তাঁর গল্প ও উপন্যাস আমাদের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এ প্রসঙ্গে তাঁর ‘আরেক ফাল্লুন’ (১৯৬৮) উপন্যাসের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সার নিখোঁজ হন। ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ তাঁকে খুঁজে বের করতে মিরপুর যান জহির রায়হান। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ।

জহির রায়হানের প্রধান প্রধান রচনা

উপন্যাস : শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্লুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৬), আর কতদিন (১৩৭৭), কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২)।

ছোটগল্প : সূর্যগ্রহণ (১৩৬২)।

জহির রায়হানের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র

জহির রায়হান পরিচালিত ছবি : কখনো আসেনি (১৯৬১), সোনার কাজল (১৯৬২), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), সঙ্গম (১৯৬৪), বাহানা (১৯৬৪), বেহলা (১৯৬৬), আনোয়ারা (১৯৬৭), জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০)।

জহির পরিচালিত প্রামাণ্য চিত্র : STOP GENOCIDE (1971) BIRTH OF A NATION (1971)

ভূমিকা

“সূর্যগ্রহণ” জহির রায়হানের একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে জহির রায়হানের আলোচ্য গল্প। গল্পটি জহির রায়হানের একমাত্র গল্পগ্রন্থ ‘সূর্যগ্রহণ’-এর অন্তর্গত। অর্থাৎ আলোচ্য গল্পটির নামেই জহির রায়হান তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন।

চলিত ভাষারীতিতে রচিত আলোচ্য গল্পে ভাষা আন্দোলনে শহীদ তসলীমের বন্ধু আনোয়ার এবং তসলীম বধু হাসিনার জীবনের যন্ত্রণা ও অসহায়তা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। জহির রায়হান ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ফলে, এ বিষয় নিয়ে তিনি অনেক সাহিত্যিকর্ম রচনা করেছেন। বিষয়বস্তু এবং শিল্পরীতির বিষয়ে ‘সূর্যগ্রহণ’ বাংলাদেশের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প হিসেবে বিবেচিত।

গ্রহণের সময় সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারে না। ফলে পৃথিবীতে নেমে আসে গভীর অন্ধকার। ভাষা আন্দোলনও তেমনি হাসিনার কাছে যেন গ্রহণ লাগা সূর্য। কেননা ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে গৌরবের অধ্যায় সৃষ্টি করলেও, তা হাসিনার বুক থেকে তার স্বামী তসলীমকে চিরদিনের জন্য দূরে সরিয়ে নেয়। সেদিক বিবেচনায় গল্পটির নাম ‘সূর্যগ্রহণ’ খুবই সার্থক ও তাৎপর্যময় হয়েছে।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. জহির রায়হানের ছোটগল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
২. ছোটগল্প হিসেবে ‘সূর্যগ্রহণ’ এর সার্থকতা বিচার করতে পারবেন।
৩. ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের ছাত্র-যুবক ও সাহিত্যিকদের কীভাবে আলোড়িত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে সম্পর্কে একটি আলোচনা লিখতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ◆ স্বামী তসলীমের প্রতি হাসিনার মিথ্যা অনুযোগের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ আনোয়ার সাহেবের মনোবেদনার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
পাওনাদার – যিনি টাকা পান, যার কাছ থেকে টাকা ঋণ আনা হয়েছে।	সকাল থেকেই মেঘ মেঘ করছিলো আকাশটা। দুপুর গড়াতেই বৃষ্টির একটানা রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বাড়ছিলো। আবার কমছিলো। রাস্তায় পায়েচলা পথিকের সাড়াশব্দ

চিবুক – খুতনি।

আলতো নাড়া – আস্তে করে
নাড়া দেয়া। এখানে আস্তে করে
আদর করা অর্থে।

অভিমান – প্রিয়জনের ব্যবহারে
বেদনাবোধ বা রাগান্বিত হওয়া।

কলগোড়া – টিউবওয়ালের
কাছে, বা টিউবওয়ালের নিচে
অর্থে।

টীকা :

সকাল থেকে মেঘ মেঘ করছিলো
সারা আকাশটা।

কবি বা সাহিত্যিকরা বিষয়বস্তুর
প্রয়োজনে কখনো কখনো
কাহিনীর মধ্যে প্রকৃতি-চিত্র
ব্যবহার করেন। আলোচ্য গল্পে
তসলীমের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী
হাসিনাকে অর্থ সাহায্যসহ
নানাভাবে সহানুভূতি জানিয়ে
এসেছেন আনোয়ার সাহেব।
তিনি গোপনেই এ কাজটি
করেছেন। তসলীম যে ভাষা
আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন এ
কথা এখনো জানেনা হাসিনা।
আজ হাসিনার চিঠি পেয়ে একে
একে সব অতীত কথা আনোয়ার
সাহেবের স্মৃতিপটে ভেসে
ওঠেছে। বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর জন্য
বেদনায় তার মন ভারাক্রান্ত
হয়েছে। আনোয়ার সাহেবের
মনোযশ্ণা প্রকাশের জন্যই
লেখক মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির ছবি
নির্মাণ করেছেন।

ছিলো না। শুধু, দূর রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছিলো গানের টুকরো টুকরো কলি।
অস্পষ্ট তার সুর। তবু বেশ লাগছিল তাঁর। আধপোড়া বিড়িটায় আগুন ধরিয়ে, ক্লান্ত
দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন আনোয়ার সাহেব।

সবেমাত্র ফিরেছেন অফিস থেকে।

একটু পরেই আবার বেরতে হবে বাইরে। টিউশনির টাকাগুলো আজ পাবার কথা।
আজ দেবেন কাল দেবেন করে অনেক ভুগিয়েচেন ভদ্রলোক। এদিকে টাকার ভীষণ
দরকার আনোয়ার সাহেবের। পাওনাদাররা তাড়া দিচ্ছে সকাল বিকেল। তার ওপর
- হঠাৎ কড়া নড়ে উঠলো জোরে। বাবু চিঠি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে আভাঙ্গা চশমাটা ধীরে নাকের ডগায় বসিয়ে দিলেন আনোয়ার
সাহেব।

হাসিনার চিঠি।

অতি পরিচিত একটা সম্বোধনের পর লিখেছে—

ওগো! এমন করে আর কতদিন দূরে ঠেলে রাখবে আমায়। আজ পুরো একটি বছর
হতে চললো প্রায়, বাড়ী আসনি তুমি। একবারটির জন্যেও তোমায় দেখিনি এ
একটি বছর। আগে, বছরে কতবার আসতে তুমি। মনে আছে সেবার খুব ঘন ঘন
এসেছিলে। মা বলছিলেন কিরে তমু। এবার যে খুব তাড়াতাড়ি এলি। অফিস বন্ধ
নাকি?

মায়ের প্রশ্নটা মৃদু হেসে এড়িয়ে গিয়েছিলে তুমি। রাতের বেলা আমার কানে কানে
বলেছিলে, কেন এত ঘন ঘন আসি জানো?

কেন?

তোমায় বারবার দেখতে ইচ্ছে করে, তাই।

হুঁ। মিথ্যে কথা : কে বললো তোমায় মিথ্যে। বলে আমার চিবুকে আলতো নাড়া
দিয়েছিলে তুমি।

কিন্তু, সেই তুমি আজ এমন হয়ে গেলে কেন? একি তোমার অভিমান, না আর
কিছু। কিন্তু কেনই বা তুমি অভিমান করবে। আমি তো কোন অন্যায় করেছি বলে
মনে হয় না। আর যদি করেই থাকি, তুমি কি ক্ষমা করে দিতে পারো না আমায়।
ওগো তোমাকে কেমন করে বোঝাই কত কষ্টে দিন কাটে আমার।

এখানে এসে হঠাৎ থামলেন আনোয়ার সাহেব। যদিও চিঠিটা শেষ হয়নি এখনও।

এখনও অনেক—অনেক কিছু লেখা আছে তার ভেতর তবু থামলেন তিনি। কেননা
ইতোমধ্যেই মাথাটা কেমন গরম হয়ে ওঠেছে তাঁর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে
এসে।

চিঠিটা টেবিলের ওপর বই চাপা দিয়ে রেখে ধীরে ওঠে দাঁড়ালেন আনোয়ার
সাহেব। কলগোড়ায় গিয়ে চোখেমুখে পানি দিলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর আবার
ফিরে এলেন ঘরে।

কি মনে করে হঠাৎ বাস্তব থেকে পুরোন চিঠিগুলোকে একে একে বের করলেন
আনোয়ার সাহেব। গত এক বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক—অনেক
লিখেছে।

কিন্তু কেন লিখেছে?

কার কাছে লিখেছে হাসিনা?

আনোয়ার সাহেবের কাছে? না-না আনোয়ার সাহেবের কাছে লিখবে কেন সে। আনোয়ার সাহেব তো কেউ নন তার। যদিও সব। তবুও কেউ নন। হায়রে। হাসিনা যদি জানতো।
--


সার-সংক্ষেপ

সকাল থেকেই আকাশে মেঘ জমে আছে। দুপুরের পর বেশ জোরে বৃষ্টি নামলো। বাইরে বৃষ্টির একটানা রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া কখনো বাড়ে, কখনো কমে। একটু আগেই অফিস থেকে ফিরে আনোয়ার সাহেব বিশ্রাম করছিলেন। কিছুসময় পরে তাকে বাইরে যেতে হবে। এক বাসায় টিউশনির টাকা আনতে যাবেন। আজ আনোয়ার সাহেবের টাকার খুব বেশি প্রয়োজন।

টাকার কথা চিন্তা করতে করতে আনোয়ার সাহেব যখন বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এমন সময় পিওন এল হাসিনার চিঠি নিয়ে। হাসিনা আনোয়ার সাহেবের বন্ধু তসলীমের স্ত্রী। তসলীম ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু আনোয়ার সাহেব একথা হাসিনাকে জানান নি। বরং তসলীমের নাম করে প্রতি মাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছে, চিঠি দিয়েছে। তসলীম যে মরে গেছে এ কথা হাসিনা কিছুতেই ভাবতে পারেনি। আজ বর্ষালগ্নে হাসিনার চিঠি পেয়ে এ-সব কথা আনোয়ার সাহেবের মানসপটে ভেসে উঠলো।

হাসিনা যেহেতু কিছুই জানে না, তাই স্বামীর কাছে অভিমান করে সে নানা কথা লিখেছে চিঠিতে। গত এক বছরে কেন তসলীম বাড়ি যায়নি এটাই হাসিনার প্রধান অভিযোগ। তাই আনোয়ার সাহেব মনে মনে ভাবছেন, হাসিনা যদি সত্যি ঘটনা জানতো, তাহলে তার জীবনে কি বেদনা নেমে আসবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।
---	--

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'সূর্যগ্রহণ' গল্পের প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করুন।
২. একটু পরে আনোয়ার সাহেব বাইরে যাবেন কেন?
৩. চিঠি পড়তে পড়তে আনোয়ার সাহেব থেমে গেলেন কেন?
৪. 'হায়রে! হাসিনা যদি জানতো।' আনোয়ার সাহেবের দৃষ্টিকোণে লেখক একথা কেন বলেছেন?
৫. তসলীমের প্রকৃত খবর আনোয়ার সাহেব হাসিনাকে জানাননি কেন?

উত্তর

প্রশ্ন : 'সূর্যগ্রহণ' গল্পের প্রাকৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করুন।

উত্তর : কবি বা সাহিত্যিকরা বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে কখনো কখনো প্রকৃতি-চিত্র ব্যবহার করেন। আলোচ্য গল্পের প্রথমেই আমরা এমন একটি প্রকৃতির ছবি পাই। সকাল থেকেই সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে আসছিল। দুপুরের পরেই খুব জোরে বৃষ্টি নামলো। বাইরে শুধু বৃষ্টির একটানা রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বেড়ে যাচ্ছিলো। বৃষ্টির বেগ কখনো বাড়ছিলো, কখনো কমছিলো। রাস্তায় পায়ের চলা পথিকের সাড়াশব্দ ছিলো না। শুধু দূর রেস্টোরাঁ থেকে ভেসে আসছিলো গানের টুকরো টুকরো কলি। প্রকৃতির এ খণ্ডচিত্র আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয়

বিষয় উপস্থাপনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃতির এ বিষণ্ণ ছবির অন্তরালে মূলত শিল্পিত হয়েছে আনোয়ার সাহেবের মনের যন্ত্রণার ছবি।

প্রশ্ন : একটু পরে আনোয়ার সাহেব বাইরে যাবেন কেন?

উত্তর : দুপুরের পর থেকে একটানা বৃষ্টি পড়লেও আনোয়ার সাহেবকে বাইরে যেতে হবে। কেননা তার টিউশনির টাকাগুলো আজ পাবার কথা। যার কাছে টাকা পান, তিনি আজ দেবেন কাল দেবেন বলে অনেক ঘুরিয়েছেন। আনোয়ার সাহেবের টাকারও খুব দরকার। এদিকে পাওনাদাররাও প্রতিনিয়ত তার কাছে টাকা চাচ্ছে। কাজেই বৃষ্টি হলেও টাকা আনার জন্য একটু পরে আনোয়ার সাহেবকে বাইরে যেতে হবে।

প্রশ্ন : ‘হায়রে! হাসিনা যদি জানতো।’ –আনোয়ার সাহেবের দৃষ্টিকোন একথা লেখক কেন বলেছেন?

উত্তর : ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে তসলীম নিহত হয়। তসলীমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনোয়ার সাহেব একথা জানলেও তসলীমের স্ত্রী হাসিনাকে কিছু জানাননি। হাসিনা মর্মান্তিক বেদনা পাবে, তাই প্রথমে আনোয়ার সাহেব প্রকৃত সত্য হাসিনাকে জানায়নি। কিন্তু পরেও সত্য কথা আর হাসিনাকে জানানো হয়নি। বরং প্রতিমাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছেন, হাসিনার নামে তসলীমের হয়ে চিঠি দিয়েছে। হাসিনা কিছুই বুঝতে পারেনি। সবই ঠিক ঠাক চলছিলো, শুধু তসলীম গত এক বছরে বাড়ি যায়নি, এটাই হাসিনার একমাত্র অভিযোগ। হাসিনা তার চিঠিতে একথাই বার বার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছে। হাসিনার সেই চিঠি পড়তে পড়তেই আনোয়ার সাহেব ভাবছেন, হায়রে কপাল! হাসিনা যদি সত্য কথা জানতো! তাহলে নিশ্চয়ই তার বেদনার কোন সীমা থাকবে না।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সকাল থেকেই মেঘ মেঘ করছিলো সারা আকাশটা।
২. সেই তুমি আজ এমন হয়ে গেছো কেন? একি তোমার অভিমান; না আর কিছু।
৩. না-না আনোয়ার সাহেবের কাছে লিখবে কেন সে। আনোয়ার সাহেব তো কেউ নন তার।
৪. হায়রে! হাসিনা যদি জানতো।

উত্তর

সেই তুমি আজ এমন হয়ে গেছো কেন? একি তোমার অভিমান, না আর কিছু।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান বিরচিত ‘সূর্যগ্রহণ’ শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে তসলীমের প্রতি হাসিনার তীব্র অভিমানের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তসলীম শহীদ হয়। একথা তসলীমের স্ত্রী হাসিনা জানেনা। কেননা বিগত এক বছরে তসলীমের বন্ধু আনোয়ার সাহেব তসলীমের হয়ে হাসিনাকে চিঠি দিয়েছে, টাকা পাঠিয়েছে। চিঠি ও টাকা পেয়ে হাসিনা বুঝেছে তসলীম ঠিকই আছে, কিন্তু বিশেষ কোন কারণে হয়তো বাড়ি আসছে না। হাসিনা ভাবছে, হয়তো তার ওপর রাগ বা অভিমান করেই তসলীম দীর্ঘ দিন বাড়ি আসেনি। তাই অভিমানহত হৃদয়ে হাসিনা তসলীমের কাছে তার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছে আলোচ্য অংশে।

হায়রে! হাসিনা যদি জানতো।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান রচিত 'সূর্যগ্রহণ' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে প্রকৃত সত্য লুকিয়ে রাখার কারণে আনোয়ার সাহেবের মনোবেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে তসলীম নিহত হয়। তসলীমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনোয়ার সাহেব একথা জানলেও তসলীমের স্ত্রী হাসিনাকে কিছু জানায়নি। হাসিনা মর্মান্তিক বেদনা পাবে, একথা ভেবে আনোয়ার সাহেব প্রথমে প্রকৃত সত্য তাকে জানায়নি। বরং প্রতি মাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছে, হাসিনার নামে তসলীমের হয়ে চিঠি দিয়েছে। এ সব কথা হাসিনা কিছুই বুঝতে পারেনি। সবই ঠিক ঠিক চলছিলো, শুধু তসলীম গত এক বছরে বাড়ি যায়নি, এটাই হাসিনার একমাত্র অভিযোগ। হাসিনা তার চিঠিতে এ কথাই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছে। হাসিনার সেই চিঠি পড়তে পড়তেই আনোয়ার সাহেব ভাবছেন, হায়রে কপাল! হাসিনা যদি সত্য কথা জানতো! তাহলে নিশ্চয়ই তার বেদনার কোন সীমা থাকবে না।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ◆ তসলীমের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ◆ তসলীমের শহীদ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করতে পারবেন।
- ◆ ভাষা আন্দোলনের সময় জনতার বিক্ষোভ এবং পুলিশের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
অন্যমনস্কভাবে – অন্য বিষয়ে মন আছে এমন, অমনোযোগী।	ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে আনোয়ার সাহেবের। চিঠিগুলোকে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ পুরোন একখানা চিঠির ওপর আলতো চোখ বুলোতে থাকেন তিনি। টাকা পেয়েছি। মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক'টা পাঠিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করো তাহলে আর বলার কিছুই নেই আমার।
আলতো – হালকা ভাবে।	যাক, মানু এখন সব সময় বাবা বাবা বলে ডাকে। যে বাবাকে জন্মের পর থেকে একবারটির জন্যেও দেখেনি। সে বাবার নামটাকেই প্রথম উচ্চারণ করেছে। কি আশ্চর্য দেখতো পুরোন চিঠিটাকে খামের ভেতর পুরে রেখে আবার নতুন চিঠিটা হাতে তুলে নেন আনোয়ার সাহেব। মানুর জন্য মন কেমন কেঁদে ওঠে তাঁর। আহা! মেয়েটাকে যদি একবার দেখতে পেতেন তিনি। কেমন হয়েছে মেয়েটা? সে কি দেখতে ঠিক তার বাবার মতই হয়েছে?
উস্কোখুস্কো – এলোমেলো, অমসৃণ।	মানুর কথা ভাবতে গিয়ে আর একটা মুখের আদল ভেসে উঠলো আনোয়ার সাহেবের চোখের ওপর-সুন্দর গোলগাল একখানা মুখ। প্রশস্ত কপালের ওপর তেলা বিহীন উস্কোখুস্কো চুল। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, হণ্ডায় মাত্র একবার সেইভ করতে তসলীম।
আলবত – নিশ্চয়, অবশ্য।	আনোয়ার সাহেব বকতেন খুব। এ আবার কেমন স্বভাব বলতো। দাড়ি রাখতে হোলে রীতিমত রেখে দাও। আর যদি মুখটাকে ন্যাড়া রাখবারই ইচ্ছে হয়ে থাকে,
লিকলিকে – লম্বা গড়নের।	
আকাশ থেকে পড়া – বিস্মিত হওয়া। হঠাৎ কোন বিস্ময় জাগানো কথা শোনা।	
মেডিকেল কলেজ – যে কলেজে ডাক্তারি শাস্ত্র পড়ানো হয়।	
মিছে কথা – মিথ্যা কথা।	
বিধবে – বিদ্ধ হবে, আঘাত করবে।	

তাহলে রোজ একবার করে সেইভ করো। এমন মুখভরা খোঁচাখোঁচা দাড়ি—একটা সৌন্দর্যজ্ঞান থাকাও তো দরকার।

বকুনি খেয়ে এরপর কয়দিন ঠিকমতো দাড়ি কামাতো তসলীম। চুলে তেলও লাগাতো বেশ পরিপাটি করে।

তারপর আবার সেই অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আনোয়ার সাহেব বলতেন। আচ্ছা তসলীম। তোমার এ স্বভাবের জন্য বৌয়ের কাছ থেকে বকুনি খাও না তুমি? আর বকুনি। কথাই বলে না বৌ। বলে মৃদু হাসতো তসলীম। বড় লাজুক মেয়ে কিনা। তাই তারপর একটু চুপ থেকে আবার বলতো। কবিরা এ রকম একটু একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ই আনোয়ার সাহেব। এ শুধু আমার বেলা নয়। কবিদের এটা স্বভাব ধর্ম।

তসলীম কবিতা লিখতো। অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওটাই ছিলো ওর একমাত্র নেশা।

আনোয়ার সাহেব ছিলেন ওর কবিতার প্রথম শ্রোতা আর প্রথম সমালোচক। শুনতে না চাইলেও জোর করে শোনাত তসলীম। তবু না শুনলে ক্ষুণ্ণ হতো সে। মাঝে মাঝে, অভিমানে কথা বলাই বন্ধ করে দিতো সে। মান ভঙ্গতে আনোয়ার সাহেবের কর্ম সাবাড়। দেখো তসলীম। আমায় শুনিয়ে কি লাভ বলতো। আমি না কবি, না সাহিত্যিক! আমি কি বুঝবো তোমার ও কবিতার। তুমিই বলো।

মুখ টিপে হাসতো তসলীম। আলবত বুঝবেন। বুঝবেন না কেন? একটু চুপ থেকে আবার বলতো সে। পড়বো, শুনবেন?

পড় না, শুন। বলতেন আনোয়ার সাহেব।

হাত নেড়ে নেড়ে পড়তো তসলীম। পড়তো না ঠিক যেন অভিনয় করতো সে।

পড়া শেষ হলে যদি বলতেন ভালো হয়েছে, তাহলে খুব খুশি হতো তসলীম। আর যদি বলতেন। কেমন যেন ভাল লাগলো না আমার। তাহলে মুখ কালো করে বলতো সে, কবিতা বোঝেনই না আপনি।

আনোয়ার সাহেব হাসতেন। কিছু বলতেন না।

কিন্তু আজ দীর্ঘ এক বছর পর হঠাৎ হাসিনার চিঠি হাতে নিয়ে তসলীমের কথা মনে পড়লো কেন আনোয়ার সাহেবের?

না। আজ বলে নয়। প্রতিদিন, যখনই হাসিনার চিঠি এসেছে তখনই তসলীমকে মনে পড়েছে আনোয়ার সাহেবের। বড্ড বেশি করে মনে পড়েছে যেন। রোগা লিকলিকে ছেলেটার কথা বারবার করে চোখের ওপর ভেসে ওঠেছে তাঁর।

বড্ড বেশি কথা বলতে পারতো তসলীম। যতক্ষণ ঘরে থাকতো, ঘরটাকে সরগরম রাখতো সে।

সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসে অশান্ত পদক্ষেপে তসলীমকে ঘরময় পায়চারি করতে দেখে প্রথমটায় কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন আনোয়ার সাহেব। কি ব্যাপার তসলীম। পাগলের মতো এমন ছুটোছুটি করছো কেন। কি হয়েছে?

কেন। আপনি কিছই শোনেননি? উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিলো তসলীম। ঘাড় নেড়েছিলেন আনোয়ার সাহেব। কই না তো। কেন কি হয়েছে? গুলি। গুলি করেছে সাহেব। আর কি হয়েছে। ইউনিভারসিটির ছেলে আর একটাও বেঁচে নেই। গিয়ে দেখে আসুন।

সে—কি? যেন আকাশ থেকে পড়েছেন আনোয়ার সাহেব।

	<p>খুব যে অবাক হচ্ছেন। বানিয়ে বলছি নাকি? গিয়ে একবার দেখে আসুন না। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক হাঁটু রক্ত জমেছে। বিবেক বিরুদ্ধে যে কোন কথাকেই বাড়িয়ে বলা তসলীমের স্বভাব ছিলো। কিন্তু তসলীম মিছে কথা বলতো না কোনদিন।</p> <p>তাই সব কিছু বিশ্বাস না হলেও গুলি চলার খবরটা যে সত্য তা বিশ্বাস না করে পারেননি আনোয়ার সাহেব।</p> <p>গুলি সত্যই চলেছিল।</p> <p>কিন্তু, সে গুলি যে তার পরদিন তসলীমের বুকেও এসে বিঁধবে তা কি সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন আনোয়ার সাহেব?</p> <p>উঃ! আজ দীর্ঘ এক বছর পর তসলীমের কথাটা মনে না পড়লেই ভাল হতো।</p>
--	---

সার-সংক্ষেপ


হাসিনার দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে আনোয়ার সাহেবের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বের হলো। অনেক করেও তিনি হাসিনার দুঃখের কোনো উপশম খুঁজে পান না। হাসিনার লেখা পুরোনো চিঠিগুলো বের করে তিনি পড়তে থাকেন। এক একটা চিঠিতে এক এক ধরনের অভিমানের কথা লেখা। ইতোমধ্যে হাসিনার গর্ভে এক কন্যাসন্তান জন্ম নিয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে মানু। মানু জন্ম নেয়া সত্ত্বেও তসলীম এখনো তাকে দেখতে যায়নি। –একথা উল্লেখ করে হাসিনা তার দুঃখের কথা লিখেছে।

হাসিনার চিঠি পড়তে পড়তেই আনোয়ার সাহেবের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তসলীমের মুখ। তসলীম উদাসীন ভাবে থাকতেন – চুল ছিল তার উক্কেখুক্কে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আনোয়ার সাহেবের বকুনি খেয়ে তসলীম কয়েকদিন পরিকার পরিচ্ছন্নভাবে চলতো। তারপর আবার পূর্ববৎ হয়ে যেতো। আনোয়ার সাহেব তসলীমের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেন। তার এ উচ্ছ্বল স্বভাবের জন্য বৌ রাগ করতো কিনা, তা জিজ্ঞাসা করতেন। তসলীম সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিতো।

তসলীমের চরিত্রে অনেক ইতিবাচক গুণের সমাবেশ ছিল। সে কবিতা লিখতো। অফিসের কাজের ফাঁকে প্রায়ই সে কবিতা লিখতো। এ অর্থে ওটাই ছিল তার একমাত্র নেশা। তসলীমের কোনো নতুন কবিতা আনোয়ার সাহেবকেই প্রথম শুনতে হতো। আনোয়ার সাহেবই ছিলেন তসলীমের কবিতার প্রথম শ্রোতা এবং প্রথম সমালোচক। আনোয়ার সাহেবের সামনে অভিনয়ের মতো করে তসলীম তার নতুন লেখা কবিতা পড়ে শোনাতো। তসলীমের কবিতা শুনে আনোয়ার সাহেব প্রশংসা করলে সে খুব খুশি হতো, আর বিরূপ সমালোচনা করলে ক্ষিপ্ত হয়ে বলতো – ‘আপনি কবিতাই বোঝেন না’। হাসিনার চিঠি পড়তে পড়তে এভাবে আনোয়ার সাহেবের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে তসলীমের নানা কথা। যতবারই তিনি হাসিনার চিঠি পড়েছেন, ততবারই সেখানে বিশাল স্মৃতি হয়ে উপস্থিত থাকে তসলীম।

হাসিনার চিঠি পড়তে পড়তে তসলীমের শেষ স্মৃতি ভেসে ওঠে আনোয়ার সাহেবের হৃদয়পটে। ভাষা আন্দোলনের পূর্বদিনে সে আনোয়ার সাহেবকে পুলিশী অত্যাচারের কথা বলেছে, সারারাত ধরে পোস্টার লিখেছে। ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগদান করার সময় পুলিশের গুলি লেগে পরদিন যে তসলীম শহীদ হবে, এ-কথা সেদিন রাতে তারা কেউ-ই জানতেন না। সেই সব বেদনাদায়ক স্মৃতি বর্ষণসিদ্ধ এ দিনে আনোয়ার সাহেবের মনটা ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ণ করে তুলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	<p>নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।</p>
---	---

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হাসিনা চিঠিতে তসলীমের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ উত্থাপন করেছে?
২. মানর কথা ভাবতে ভাবতে আনোয়ার সাহেবের আচরণগত কী পরিবর্তন ঘটলো?
৩. তসলীমের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করুন।
৪. আনোয়ার সাহেবের তসলীমের কবিতা শোনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।
৫. ভাষা-আন্দোলনের পূর্বদিনে তসলীমের অস্থিরভাবে পায়চারী করার কারণ কী?
৬. মিছিলে অংশগ্রহণের ফলে তসলীমের কী হয়েছিল?

উত্তর

প্রশ্ন : হাসিনা তার চিঠিতে তসলীমের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ উত্থাপন করেছে?

উত্তর : হাসিনা তার চিঠিতে তসলীমের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। প্রথম, তসলীম গত এক বছরে একবারও বাড়ি যায়নি। এটাই তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ। তাই সে লিখেছে টাকা পাঠানোই বড় কথা নয়, বরং স্বামী হিসেবে তার আরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। হাসিনার ভাষায় “টাকা পেয়েছি। মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক’টি পাঠিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করো, তাহলে আর বলার কিছুই নেই আমার।” তসলীমের বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ আছে হাসিনার। হাসিনার গর্ভে যে কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সে এখনো তার পিতার মুখ দেখেনি। কন্যাকে একবারও দেখতে না আসার জন্যও তসলীমের বিরুদ্ধে হাসিনা প্রবল অভিযোগ উত্থাপন করেছে।

প্রশ্ন : তসলীমের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করুন।

উত্তর : আলোচ্য পাঠে আমরা তসলীমের বেশ কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। প্রথমত, তসলীম ছিল উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। সুন্দর গোলগাল মুখের অধিকারী প্রশস্ত কপালধারী তসলীমের চুল ছিল তেলহীন ও উস্ফোখুস্ফো। তার মুখভরা ছিল খোঁচা-খোচা দাড়ি। আনোয়ার সাহেব বকা দিলে কয়েক দিন সে পরিচ্ছন্ন থাকতো, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তসলীম আবার পূর্ববৎ। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং শরীরের দিকে তার কোন খেয়াল থাকতো না। তসলীমের চিন্তের মধ্যে সর্বদা সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা বিরাজ করতো। তাই অফিসের কর্মচারী হয়েও সে ছাত্রদের মিছিলে যোগদান করেছে, সারা রাত ধরে লিখেছে পোস্টার। তসলীম ছিল সাহসী মানুষ। তাই পুলিশের অত্যাচারের সামনেও সে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। গুলিবর্ষণের মুখেও সে পালিয়ে যায়নি, বরং বীরের মতো আত্মসমর্পণ দিয়েছে।

তসলীম ছিলো সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী। সে কবিতা লিখতো। অফিসের কাজের ফাঁকে সে কবিতা লিখতো। বস্তুত, এটাই ছিল তার একমাত্র নেশা। আনোয়ার সাহেবকে কবিতা শুনিতে সে খুব আনন্দ পেতো। বর্তমান পাঠে তসলীমের এসব বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন : আনোয়ার সাহেবের তসলীমের কবিতা শোনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

উত্তর : তসলীম ছিলো সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী। সে কবিতা লিখে প্রথমেই আনোয়ার সাহেবকে শোনাতে। বস্তুত, আনোয়ার সাহেবই ছিলেন তার কবিতার প্রথম পাঠক এবং প্রথম সমালোচক। আনোয়ার সাহেব কবিতা শুনতে না চাইলেও তসলীম তাকে জোর করে কবিতা শোনাতে। আনোয়ার সাহেব যদি বলেন, আমি কবিতা বুঝবো না। বরং অন্য কাউকে শোনাও। এ কথায় তসলীম বলতো ‘আলবত বুঝবেন। বুঝবেন না কেন’, আনোয়ার সাহেবের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে তসলীম কবিতা পড়তো, মনে হতো সে যেন অভিনয় করছে। আনোয়ার সাহেব তসলীমের কবিতা শুনে যদি প্রশংসা করতেন, তাহলে সে খুব খুশি হতো। আর যদি বলতেন, কবিতাটা তেমন ভালো লাগেনি, তাহলে রাগ করে তসলীম আনোয়ার সাহেবকে বলতো - “কবিতা বোঝেনই না আপনি।” তসলীমের এমন কথা শুনে আনোয়ার সাহেব হাসতেন, কিছু বলতেন না। এভাবেই চলতো আনোয়ার সাহেবের তসলীমের কবিতা শোনার পালা।

প্রশ্ন : ভাষা আন্দোলনের পূর্বদিনে তসলীমের অস্থিরভাবে পায়চারী করার কারণ কী?

উত্তর : ভাষা আন্দোলনের পূর্বদিন বিকেলে বাসায় ফিরে তসলীম অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে। কি করবে তা যেন স্থির করতে পারছিল না তসলীম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি করেছে। মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ গুলি চালিয়েছে। ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামীকাল তারা আবার মিছিল করবে, পুলিশী বাধা অমান্য করবে। আগামীকালের সেই যুদ্ধে তসলীম কিভাবে অংশগ্রহণ করবে, তার দায়িত্ব কি হবে ইত্যাদি ভাবতে ভাবতেই সে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক’টি পাঠিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করো তা হলে আর বলার কিছুই নেই আমার।
২. মানুষের জন্য মন কেমন কেঁদে ওঠে তাঁর। আহা! মেয়েটাকে যদি একবার দেখতে পেতেন তিনি।
৩. আজ দীর্ঘ এক বছর পর হঠাৎ হাসিনার চিঠি হাতে নিয়ে তসলীমের কথা মনে পড়লো কেন আনোয়ার সাহেবের?
৪. তাই সব কিছু বিশ্বাস না হলেও গুলি চলার খবরটা যে সত্য তা বিশ্বাস না করে পারেননি আনোয়ার সাহেব।
৫. উঃ! আজ দীর্ঘ এক বছর পর তসলীমের কথাটা মনে না পড়লেই ভাল হতো।

মানুষের জন্য মন কেমন কেঁদে ওঠে তাঁর। আহা! মেয়েটাকে যদি একবার দেখতে পেতেন তিনি।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান বিরচিত ‘সূর্যগ্রহণ’ শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে তসলীমের শিশুকন্যার কথা ভেবে আনোয়ার সাহেবের অন্তর্বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তসলীম শহীদ হয়েছে। একথা তসলীমের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আনোয়ার সাহেব জানলেও তিনি তা তসলীমের বাড়িতে জানাননি। বরং তসলীমের পরিবারে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছেন, হাসিনার কাছে তসলীমের নামে চিঠি পাঠিয়েছেন। এ-ঘটনার পর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তার স্ত্রী কিছুই জানে না বলে তসলীমের বিরুদ্ধে অভিমান করে চিঠি লিখেছে, কেন এক বছরেও সে একবার বাড়ি গেল না। এমনকি কয়েকমাস পূর্বে জন্ম নেয়া তার শিশুকন্যাটিকে দেখতেও একবার এলো না তসলীম। হাসিনার চিঠিতে শিশুকন্যা মানুষের কথা পড়তে পড়তেই আনোয়ার সাহেব উন্মনা হয়ে যান। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে উস্কো-খুস্কো চুলের এক যুবকের মুখচ্ছবি। তিনি ভাবেন, যদি একবার মানুষকে দেখতে পেতেন। কেননা, তার ধারণা মানুষের চোখে মুখে তিনি খুঁজে পাবেন চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া তসলীমের মুখের আদল।

উ : ! আজ দীর্ঘ এক বছর পর তসলীমের কথাটা মনে না পড়লেই ভাল হতো।

আলোচ্য অংশটুকু কথাশিল্পী জহির রায়হান রচিত ‘সূর্যগ্রহণ’ শীর্ষক ছোটগল্প থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এখানে তসলীমের মৃত্যুতে আনোয়ার সাহেবের অন্তঃরহস্য বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তসলীম শহীদ হয়েছে। একথা তসলীমের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আনোয়ার সাহেব জানলেও তিনি তা তসলীমের বাড়িতে জানাননি। বরং তসলীমের পরিবারের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য মাসে মাসে টাকা পাঠিয়েছেন, তার বিধবা স্ত্রী হাসিনার কাছে তসলীমের নামে চিঠি লিখেছে। তসলীমের মৃত্যুর পর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। হাসিনা কিছুই জানেনা বলে এ এক বছরে তসলীমের বিরুদ্ধে নানা অনুযোগ করে অভিমানহত হৃদয়ে অনেক চিঠি লিখেছেন। সে চিঠিতে কখনো আছে ভালোবাসার কথা, কখনো আবেগের কথা, কখনো অভিমানের কথা, কখনো বা অনুযোগের কথা। বৃষ্টিভেজা দুপুরে সে সব চিঠি পড়তে পড়তেই আজ বিশেষ মুহূর্তে বার বার আনোয়ার সাহেবের চোখের সামনে ভেসে উঠছে তসলীমের মুখছবি। তসলীম যেদিন শহীদ হয়, তার পূর্বরাত্রে তার অস্থিরতার কথা আনোয়ার সাহেবের স্মৃতিতে এখনো জীবন্ত। যতই তসলীমের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন আনোয়ার সাহেব, ততই তার হৃদয় বেদনা ও বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত হয়েছে। তাই তিনি ভাবছেন, দীর্ঘ এক বছর পর আজ তসলীমের কথাটা মনে না হলেই ভাল হতো।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ◆ তসলীমের কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ◆ তসলীমের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা প্রহসনের আশ্রয় নেয়া সম্পর্কে আনোয়ার সাহেবের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দ্বন্দ্বের পরিচয় প্রদান করতে পারবেন।
- ◆ তসলীমের পরিবারের দুরবস্থার পরিচয় দিতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নবজাত – নতুন জাত, সদ্য প্রসূত বা সদ্য উৎপন্ন।	মাথাটা ভীষণ ধরেছে আনোয়ার সাহেবের। টেবিলের ওপর হাসিনার পুরোন চিঠিগুলোর দিকে একবার তাকালেন। এ এক বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক- অনেক লিখেছে।
বন্দোবস্ত – ব্যবস্থা।	বাড়ী না আসার কি কারণ থাকতে পারে তোমার? আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, না হয় আমার ওপর রাগ করেছো তুমি। কিন্তু তোমার নবজাত শিশু, সেতো কোন অপরাধ করেনি। তাকে দেখবার জন্যেও কি একবার বাড়ী আসতে পারো না তুমি?
অন্তর্দ্বন্দ্ব – ভিতরে ভিতরে দ্বন্দ্ব, নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ।	মিনুর বিয়ের বয়স হয়েছে। তার বিয়ে শাদীর বন্দোবস্ত একটা করতে হবে বইকি। মা-তো তোমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন। তুমি ছাড়া পরিবারে আর কেই বা আছে যে তার বিয়ে শাদীর বন্দোবস্ত করবে? চিঠিটা মুড়ে আবার খামের ভেতর রেখে দিলেন আনোয়ার সাহেব। দু’হাতের তালুতে মুখ গুঁজে চুপ
তোলপাড় – আলোড়ন, ওলট-পালট।	
চুকিয়ে – শেষ করে, সমাপ্ত করে।	
শিকড় গাড়ছে – মাটিতে শিকড় প্রোথিত হওয়া। এখানে তসলীমের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া	

<p>অর্থে ব্যবহৃত।</p> <p>প্রহসন – পরিহাস। এখানে মিথ্যা অভিনয় অর্থে ব্যবহৃত।</p> <p>আশঙ্কা – ভয়, ভীতি, সংশয়।</p> <p>পদক্ষেপ – পদচারণা, পা ফেলার কাজ।</p> <p>ডুকরে কাঁদা – হঠাৎ চীৎকার করে কাঁদা।</p> <p>রুদ্ধ – বন্ধ।</p> <p>উপার্জনক্ষম – যিনি উপার্জন করতে পারেন বা করেন, যিনি অর্থ আয় করেন।</p>	<p>করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। একটা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব মনের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁর।</p> <p>না-না মানু, মিনু সবাইকে ভুলে যেতে চান তিনি। ভুলে যেতে চান হাসিনাকে। আম্মাকে। সবাইকে। গোটা পরিবারটাকে। তবু, ভুলতে পারেন কই আনোয়ার সাহেব? যত ভাবেন সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে দেবেন। তত যেন মনের ভেতর আরো বেশি করে শিকড় গাড়াচ্ছে ওরা। সারাদিন ওদের কথাই শুধু ভাবেন আনোয়ার সাহেব।</p> <p>উঃ এ-প্রহসন আর কতদিন চালাবেন তিনি!</p> <p>স্মৃতিপটে আবার উঁকি মারছে তসলীম। তসলীমের রক্তাক্ত দেহ। কিন্তু, দেহের কথাটা নিছক কল্পনাই করছেন আনোয়ার সাহেব। গুলিবিদ্ধ তসলীমের রক্তাক্ত দেহটা দেখেননি তিনি। দেখেননি বলে তো একটা গভীর সন্দেহে আজো মন তোলপাড় করছে তাঁর। সত্যিই কি মরেছে তসলীম?</p> <p>একুশের সারারাত এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি সে। বসে বসে পোস্টার লিখেছে, অসংখ্য পোস্টার।</p> <p>পরদিন সকালে যখন বাইরে বেরুচ্ছিলো তখন নিষেধ করেছিলেন আনোয়ার সাহেব। আজ তোমার বাইরে বেরোনো ঠিক হবে না তসলীম। যা মেজাজ তোমার। কি করতে কি করে বসবে ঠিক নেই। তার চাইতে ঘরে বসে বসে ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লিখো। সেটাও একটা কাজ।</p> <p>সে কথা শুনেও আমল দেয়নি তসলীম। বলেছে। আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে? বলে বেরিয়ে গেছে সে। সেদিন আর ফেরেনি।</p> <p>তার পরদিন।</p> <p>তার পরদিনও না।</p> <p>থানায় খোঁজ করে দেখেছেন আনোয়ার সাহেব। জেল গোটে খোঁজ করেছেন। খোঁজ করেছেন হাসপাতালে। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি তাকে। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে ওঠেছে আনোয়ার সাহেবের। অশান্ত পদক্ষেপে, অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। শেষে তাঁর এক সহকর্মী বজলু সাহেবের কাছ থেকে শুনেছেন আসল খবরটা। হাইকোর্টের মোড়ে গুলি চলবার সময় তসলীমকে একবার দেখেছিলেন তিনি।</p> <p>আর দেখেননি।</p> <p>আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তসলীমের। তসলীম মারা গেছে।</p> <p>হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠেছিলেন আনোয়ার সাহেব। এ কি হলো বজলু সাহেব। ওর বৌ পরিবারের কি হবে। ওদের যে কেউ নেই। কেউ নেই! ধরা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন বজলু সাহেব।</p> <p>না। কেউ নেই। বলেছিলেন আনোয়ার সাহেব। ওর বৌ, মা, বোন ওদের কি হবে বজলু সাহেব?</p> <p>কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে তাঁর কণ্ঠস্বর।</p> <p>অনেকটা মাতালের মত টলতে টলতে বাসায় ফিরে এসেছিলেন আনোয়ার সাহেব। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই নজরে পড়ছিলো তাঁর। ডাক বাঞ্চে একখানা চিঠি। তসলীমের চিঠি। পরের চিঠি পড়ার অভ্যাস কোনদিনও ছিল না আনোয়ার</p>
---	--

	<p>সাহেবের। কিন্তু, সেদিন পড়েছেন।</p> <p>বহু পরিচিত একটা সম্বোধনের পর, গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলী লেখা। আজ ক’দিন থেকে মিনুর জ্বর। আমারও শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না। কানু শেখ তার পাওনা টাকার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছে। মাইনে পাওয়া মাত্র টাকা পাঠিয়ে। ঘরে চাল ডাল কিছুই নেই। এক বেলা আলু আর এক বেলা ভাত খাচ্ছি।</p> <p>চিঠিটা পড়ে মনটা আরো বেশি রকম খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আনোয়ার সাহেবের। সারা রাত জেগে শুধু ভেবেছেন তিনি তসলীমের মৃত্যু খবরটা কি জানাবেন হাসিনাকে। চিঠি লিখে কি জানিয়ে দেবেন ওদের যে তসলীম মারা গেছে। ওদের পরিবারে একমাত্র উপার্জনক্ষম লোকটা আর বেঁচে নেই।</p> <p>এ আঘাত কি সহ্যে পারবে ওরা?</p> <p>মাথার ভেতরটা আবার গরম হয়ে ওঠেছে আনোয়ার সাহেবের। সামনে টেবিলের ওপর রয়েছে হাসিনার চিঠিগুলো। এ ক’বছরে কম চিঠি লিখেনি হাসিনা। অনেক-অনেক লিখেছে।</p> <p>ওগো, আর কতদিন বাড়ী আসবে না তুমি? তুমি কি মাস মাস টাকা পাঠিয়েই শুধু নিশ্চিত থাকবে? মা যে তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলো।</p> <p>ওগো.....।</p>
--	--

সার-সংক্ষেপ

হাসিনার চিঠিগুলো পড়তে পড়তে আনোয়ার সাহেব অতীত-স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকেন। এ এক বছরে অনেক চিঠি লিখেছে হাসিনা। চিঠিতে আছে নানা অভিমান-অভিযোগের কথা। এবার যে চিঠিটা পড়ছেন, তাতে হাসিনা লিখেছে নবজাত কন্যা মানুষকে আজ পর্যন্ত কেন দেখতে এলো না তসলীম? শিশুকন্যা মানুষ এমন কি অপরাধ করেছে যে, আজ পর্যন্ত সে পিতার মুখ দেখতে পেলো না? অন্য চিঠিতে লিখেছে তসলীমের বোন মিনুর বিয়ে দেয়ার কথা। মিনুর বয়স হয়েছে, অথচ বিয়ে দেয়া যাচ্ছে না। বোনের বিয়ের জন্যও তো তসলীমের বাড়ি আসা প্রয়োজন। এসব কথা ভেবে ভেবে আনোয়ার সাহেবের মনটা বিষণ্ণতায় ভরে যায়। এতকাল সত্য কথা না জানিয়ে একটা মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছে বলে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব মনের ভিতরটায় আলোড়ন ওঠে।

আনোয়ার সাহেব বছবার ভেবেছেন তসলীমের পরিবার থেকে তিনি নীরবে দূরে চলে যাবেন। কিন্তু ভাবনাই সার, দূরে আর চলে যাওয়া হয় না। বরং যতই দূরে যেতে চান, ততই যেন ওদের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যান।

যেদিন তসলীম শহীদ হলো, তার পূর্বরাত্রের স্মৃতি আনোয়ার সাহেবের মনে বারবার ভেসে ওঠে। সারা রাত ধরে তসলীম পোস্টার লিখেছে, অস্থিরভাবে পায়চারি করেছে। পরদিন সকালে মিছিলে না যাবার জন্যে আনোয়ার সাহেব তাকে অনুরোধ করেছেন, বলেছেন ‘মিছিলে না গিয়ে ঘরে বসে কবিতা লেখো। ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লেখাও তো একটা কাজ।’ কিন্তু তসলীম তার সিদ্ধান্তে ছিল অটল। তাই চটপট উত্তর দিয়েছে – “আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?” এ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তসলীম। কিন্তু আর সে ফেরেনি। আনোয়ার সাহেব তাকে অনেক খুঁজেছেন। অবশেষে জেনেছেন, তসলীম শহীদ হয়েছে।

তসলীমের মৃত্যুর সংবাদ জেনে বিষণ্ণ মনে বাসায় ফেরার পরই পেয়েছেন হাসিনার চিঠি। বাধ্য হয়েই সেদিন তসলীমকে লেখা হাসিনার চিঠি পড়েছেন। সেই থেকে মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছেন তিনি। হাসিনাকে বুঝতে দিচ্ছেন না যে তার স্বামী মারা গেছেন। অথচ এ দুর্ভাগ্য আর বহন করতেও পারছেন না তিনি। এমনি এক জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন আনোয়ার সাহেব। হাসিনার চিঠি একটার পর একটা পাঠ করছেন, আর ভয়াবহ বেদনার মধ্যে, মর্মান্তিক স্মৃতির মধ্যে তিনি নিপতিত হচ্ছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন



নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. বর্তমান পাঠের চিঠিতে হাসিনা তসলীমের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ উত্থাপন করেছে?
২. তসলীমের পরিবারের সঙ্গে আনোয়ার সাহেব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চান কেন?
৩. একুশের সকালে তসলীম ও আনোয়ার সাহেবের কথোপকথনের পরিচয় দিন।
৪. কান্নায় আনোয়ার সাহেবের কণ্ঠস্বর কেন রুদ্ধ হয়ে এলো?
৫. তসলীমের মৃত্যু সংবাদ হাসিনাকে কেন জানান নি আনোয়ার সাহেব?
৬. হাসিনার পরিবারের দুরবস্থার কি পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য পাঠে?

উত্তর

প্রশ্ন : বর্তমান পাঠের চিঠিতে হাসিনা তসলীমের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করেছে?

উত্তর : হাসিনা তার সব চিঠিতেই অভিমানাহত হৃদয়ে নানা অভিযোগের কথা উত্থাপন করেছে। হাসিনার জানা মতে তার স্বামী তসলীম বেঁচে আছে। কিন্তু বিগত এক বছরেও সে একবার বাড়ি আসেনি। এটাই তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ। হাসিনার যে চিঠিটা এবার আনোয়ার সাহেব পড়ছেন, তাতে সে লিখেছে নবজাত কন্যা মানুষকে আজ পর্যন্ত কেন দেখতে এলো না তসলীম? শিশুকন্যা মানুষ এমন কি অপরাধ করেছে যে, আজ পর্যন্ত সে পিতার মুখ দেখতে পেলো না? অন্য চিঠিতে লিখেছে, তসলীমের বোন মিনুর বিয়ে-দেওয়ার কথা। মিনুর বয়স হয়েছে, অথচ বিয়ে দেয়া যাচ্ছে না। বোনের বিয়ের জন্যও তো তসলীমের একবার বাড়ি আসা প্রয়োজন। তসলীমের আন্মাও পুত্রের জন্য সব সময় কান্না করেন। অথচ পুত্রের বাড়ি ফেরার কোনো সংবাদ নেই। এইসব নানা অভিযোগে পূর্ণ হাসিনার চিঠি।

প্রশ্ন : তসলীমের পরিবারের সঙ্গে আনোয়ার সাহেব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চান কেন?

উত্তর : তসলীমের মৃত্যুর পর পুরো একটি বছর ধরে তসলীমের পরিবারের সঙ্গে আনোয়ার সাহেব মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছেন। তসলীমের মৃত্যুসংবাদ তিনি হাসিনাকে জানাননি। কেননা, তিনি ভেবেছেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষের মৃত্যুসংবাদ পেলে গোটা পরিবার ভেঙে পড়বে। তাই তিনি মিথ্যা প্রহসনের আশ্রয়ে প্রতি মাসে তসলীমের বিধবা-স্ত্রী হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছেন, তসলীমের নামে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু এককাল পরে পুরো বিষয়টি এখন আনোয়ার সাহেবের কাছে দুর্ভার বলে মনে হচ্ছে। মানুষ, মিনু, হাসিনা, তসলীমের আন্মা গোটা পরিবারকেই এখন ভুলে যেতে চান আনোয়ার সাহেব। তিনি ভাবছেন, সম্পর্কটা চুকিয়ে দিতে পারলেই প্রবল দুর্ভার ও যল্ণা থেকে তিনি মুক্তি পাবেন। কিন্তু তার ভাবনাই সার হয়, তসলীমের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তিনি আর চুকিয়ে দিতে পারেন না। যতই তিনি সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়ার কথা ভাবেন, ততই তিনি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আটকা পড়ে যান তসলীমের পরিবারের সঙ্গে।

প্রশ্ন : একুশের সকালে তসলীম ও আনোয়ার সাহেবের কথোপকথনের পরিচয় দিন।

উত্তর : হাসিনার চিঠি পড়তে পড়তে আনোয়ার সাহেবের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে তসলীমের মুখছবি। এভাবেই এক সময় তিনি একুশের রাতের স্মৃতি রোমন্থন করেন। একুশের রাতে তসলীম অস্থিরভাবে পায়চারি করেছে, সারারাত ধরে পোস্টার লিখেছে। বিপদের আশঙ্কা করে আনোয়ার সাহেব তসলীমকে মিছিলে যেতে বারণ করেছেন। বলেছেন, ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লেখাও একটা বড় কাজ, তুমি বাসায় বসে কবিতা লেখো। কিন্তু তসলীম তার কথা শোনেনি। চটপট উত্তর দিয়েছে— “আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?” এ-কথা বলে একুশের সকালে ভাষার মিছিলে বেরিয়ে পড়ে তসলীম।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন



যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. একটা গভীর অন্তর্দন্দে মনের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁর।
২. যত ভাবেন সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে দেবেন, তত যেন মনের ভেতর আরো বেশি করে শিকড় গাড়াচ্ছে ওরা।
৩. দেখেন নি বলে তো একটা গভীর সন্দেহে আজো মন তোলপাড় করছে তাঁর।
৪. আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?
৫. মা যে তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলো।

উত্তর

একটা গভীর অন্তর্দন্দে মনের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে তাঁর।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান বিরচিত ‘সূর্যগ্রহণ’ শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। হাসিনার চিঠি পাঠ করতে করতে নিজের মিথ্যা অভিনয়ের কথা ভেবে আনোয়ার সাহেবের মনের যন্ত্রণার কথা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

একুশের সকালে ভাষার দাবিতে মিছিলে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তসলীম শহীদ হয়। তসলীমের অন্তরঙ্গ সুহৃদ আনোয়ার সাহেব একথা জানলেও তসলীমের মৃত্যু সংবাদ হাসিনার কাছে জানায়নি। বরং প্রতি মাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছে, তসলীমের নামে চিঠি পাঠিয়েছে। হাসিনা ভেবেছে, তসলীম বুঝি অভিমান করে বাড়ি আসছে না। তাই সে-ও অভিমানহত চিন্তে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করে তসলীমের কাছে চিঠি লিখেছে। হাসিনা লিখেছে, নবজাত কন্যা মানুষকে আজ পর্যন্ত কেন দেখতে এলো না তসলীম। শিশুকন্যা মানু এমন কি অপরাধ করেছে যে, আজ পর্যন্ত সে পিতার মুখ দেখতে পেলো না? অন্য চিঠিতে লিখেছে তসলীমের বোন মিনুর বিয়ে দেয়ার কথা। মিনুর বয়স হয়েছে, অথচ বিয়ে দেয়া যাচ্ছে না। বোনের বিয়ের জন্যও তো তসলীমের বাড়ি আসা প্রয়োজন। হাসিনার অভিমান আর অনুযোগে পূর্ণ এসব চিঠি পড়তে পড়তে আনোয়ার সাহেবের মনটা গভীর বিষণ্ণতায় ভরে যায়। এতকাল সত্য কথা না জানিয়ে একটা মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছে বলে গভীর অন্তর্দন্দে তার মনের ভিতর তোলপাড় ওঠে।

যত ভাবেন সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে দেবেন, তত যেন মনের ভেতর আরো বেশি করে শিকড় গাড়াচ্ছে ওরা।

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান বিরচিত ‘সূর্যগ্রহণ’ শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। মিথ্যা প্রহসন করে যাচ্ছেন বলে সে সীমাহীন অন্তর্দন্দ ও দুর্ভার যন্ত্রণায় নিপতিত হয়েছেন আনোয়ার সাহেব, তার পরিচয় ফুটে ওঠেছে আলোচ্য অংশে।

তসলীমের মৃত্যুর পর পুরো একটি বছর ধরে তসলীমের পরিবারের সঙ্গে আনোয়ার সাহেব মিথ্যা অভিনয় করে যাচ্ছেন। তসলীমের মৃত্যুসংবাদ এ-যাবৎ তিনি হাসিনাকে জানাননি। কেননা, তিনি ভেবেছেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষের মৃত্যুসংবাদ পেলে গোটা পরিবার ভেঙে পড়বে। তাই তিনি মিথ্যা প্রহসনের আশ্রয়ে প্রতি মাসে তসলীমের বিধবা-স্ত্রী হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছেন, তসলীমের নামে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু এতকাল পরে পুরো বিষয়টি এখন আনোয়ার সাহেবের কাছে দুর্ভার বলে মনে হচ্ছে। শানু, মিনু, হাসিনা, তসলীমের আত্মা গোটা


পরিবারকেই এখন ভুলে যেতে চান আনোয়ার সাহেব। তিনি ভাবছেন, সম্পর্কটা চুকিয়ে দিতে পারলেই প্রবল দুর্ভার ও মনোযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন। কিন্তু তার ভাবনাই সার হয়, তসলীমের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তিনি আর চুকিয়ে দিতে পারেন না। যতই তিনি সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়ার কথা ভাবেন, ততই যেন তিনি আষ্টে-পৃষ্ঠে আটকা পড়ে যান তসলীমের পরিবারের সঙ্গে।

আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?

আলোচ্য অংশটুকু জহির রায়হান লিখিত ‘সূর্যগ্রহণ’ শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে মাতৃভাষার প্রতি তসলীমের গভীর অনুরাগ ও ভালবাসার কথা প্রকাশিত হয়েছে।

একুশের রাতে তসলীম কখনো অস্থির ভাবে পায়চারি করেছে, কখনো বা পোস্টার লিখেছে। একুশের দিন সকালে মিছিলে যাবার জন্যে উদ্যোগ নিতে থাকলে আনোয়ার সাহেব মিছিলে না যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি তসলীমকে বলেছেন, ‘ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লেখাও একটা মস্ত কাজ। অতএব, তুমি বাসায় বসে কবিতা লেখো।’ কিন্তু আনোয়ার সাহেবের এ-বক্তব্য তসলীম মেনে নিতে পারেনি। বরং সে দপ করে জ্বলে ওঠেছে, ভাষার মর্যাদা রক্ষার অসীম সাহসী যোদ্ধার মতো বলে ওঠেছে ভাষাই যদি না থাকে, তাহলে কবিতা লিখবো কি দিয়ে। তসলীমের এ মন্তব্যে মাতৃভাষার প্রতি তার গভীর অনুরাগ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামেই অবশেষে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।
---	--

১. ‘সূর্যগ্রহণ’ গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
২. তসলীম চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।
৩. আনোয়ার সাহেবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৪. তসলীমের বিরুদ্ধে হাসিনা যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তা লিপিবদ্ধ করুন।
৫. ছোটগল্প হিসেবে ‘সূর্যগ্রহণে’-র সার্থকতা বিচার করুন।

প্রশ্ন : তসলীম চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : জহির রায়হানের ‘সূর্যগ্রহণ’ ছোটগল্পের একটি পরোক্ষ চরিত্র তসলীম। পরোক্ষ হয়েও এ চরিত্রই হয়ে ওঠেছে আলোচ্য ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আমরা গল্পের মধ্যে যখন তসলীমকে পাই, তারো এক বছর পূর্বে ভাষার দাবীতে মিছিল করতে গিয়ে সে শহীদ হয়। কাজেই গল্পে তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির প্রশ্ন আসে না। বরং পরোক্ষ থেকেও আনোয়ার সাহেবের স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে তসলীমই হয়ে ওঠেছে বর্তমান ছোটগল্পের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র।

তসলীম ছিল উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। সুন্দর গোলগাল মুখের অধিকারী প্রশস্ত ললাটধারী তসলীমের চুল ছিলো তেলহীন ও উস্কোখুস্কো। তার মুখভরা ছিলো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আনোয়ার সাহেব বকা দিলে কয়েক দিন সে পরিচ্ছন্ন থাকতো, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তসলীম আবার পূর্ববৎ। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং শরীরের দিকে তার কোন খেয়াল থাকতো না। তসলীমের মনের মধ্যে সর্বদা সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা বিরাজ করতো। তাই অফিসের কর্মচারী হয়েও সে ছাত্রদের মিছিলে যোগ দিয়েছে, সারারাত ধরে লিখেছে পোস্টার, তসলীম ছিলো সাহসী মানুষ। তাই পুলিশের অত্যাচারের সামনেও সে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। গুলিবর্ষণের মুখেও সে পালিয়ে যায়নি, বরং বীরের মতো আত্মসর্জন দিয়েছে।

তসলীম ছিলো সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী। তসলীম কবিতা লিখতো। অফিসের কাজের ফাঁকে সে কবিতা লিখতো-বস্ত্রত, এটাই ছিলো তার একমাত্র নেশা। আনোয়ার সাহেবকে কবিতা শুনিয়ে সে খুব আনন্দ পেতো। তসলীমের কবিতা শুনে আনোয়ার সাহেব যদি প্রশংসা করতেন, তাহলে সে খুব খুশি হতো। আর যদি বলতেন, কবিতাটা তেমন ভালো লাগেনি, তাহলে রাগ করে তসলীম বলতো “কবিতা বোঝেনই না আপনি।”

বিশেষ ঘটনাকে একটু বাড়িয়ে বললেও, তসলীম কখনো মিথ্যা কথা কলতো না। বিবেক বিরুদ্ধ ও অন্যায় কর্মকে সে সব সময় বাড়িয়ে বলতো। তাই মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলি বর্ষণের ঘটনাকে আনোয়ার সাহেবের কাছে বলেছে এভাবে- “গুলি, গুলি করেছে সাহেব। আর কি হয়েছে। ইউনিভারসিটির ছেলে আর একটাও বেঁচে নেই। গিয়ে দেখে আসুন। মেডিক্যাল কলেজের সামনে একহাঁটু রক্ত জমেছে।

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে তসলীম কখনো অবহেলা করেনি। দরিদ্র পরিবারকে একাই সে টেনে তোলার চেষ্টা করেছে। চাকরি করলেও প্রায়ই সে বাড়িতে যেত সকলের খোঁজ-খবর নিতে। এ-কারণেই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে হাসিনা তাকে বহু অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, মেলাতে পারেনি পূর্বের মানুষের সঙ্গে বর্তমান মানুষের আচরণ।

মাতৃভাষার প্রতি প্রবল ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তসলীম চরিত্রের গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। একুশের রাতে তসলীম কখনো অস্থিরভাবে পায়চারি করেছে, কখনো বা পোস্টার লিখেছে। একুশের দিন সকালে মিছিলে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকলে আনোয়ার সাহেব তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আনোয়ার সাহেব বলেছেন, ভাষার লড়াই নিয়ে কবিতা লেখাও একটা মস্ত কাজ। অতএব, তুমি বাসায় বসে কবিতা লেখো।’ কিন্তু আনোয়ার সাহেবের এ বক্তব্য তসলীম মেনে নিতে পারেনি। বরং সে দপ করে জ্বলে ওঠেছে, ভাষার মর্যাদা রক্ষায় অসীম সাহসী যোদ্ধার মতো বলে ওঠেছে— “আগে ভাষাকে বাঁচাতে হবে। ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?” তসলীমের এ সংলাপে মাতৃভাষার প্রতি তার গভীর অনুরাগ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামেই অবশেষে সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে।

প্রশ্ন : তসলীমের বিরুদ্ধে হাসিনা যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছে, তা লিপিবদ্ধ করুন।

উত্তর : আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে তসলীম নিহত হয়। তসলীমের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ আনোয়ার সাহেব একথা জানলেও তা তিনি তসলীমের বিধবা স্ত্রী হাসিনাকে জানাননি। হাসিনা মর্মান্তিক বেদনা পাবে, তাই প্রথমে আনোয়ার সাহেব প্রকৃত সত্য হাসিনাকে জানায়নি। কিন্তু প্রতি মাসে হাসিনার কাছে টাকা পাঠিয়েছে, হাসিনার নাম তসলীমের হয়ে চিঠি দিয়েছে। হাসিনা সত্য ঘটনা কিছুই জানেনা। সবই ঠিক ঠাক চলছিলো, শুধু তসলীম গত এক বছরে বাড়ি যায়নি, এটাই হাসিনার প্রধান অভিযোগ। হাসিনা তার চিঠিতে এ-কথাই বার বার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছে।

গত এক বছরে একবারও বাড়ি যায়নি বলে হাসিনা তসলীমকে অভিযুক্ত করে লিখেছে— “..... টাকা পেয়েছি। মাসে মাসে বাজার খরচের টাকা ক’টি পাঠিয়েই যদি তুমি তোমার দায়িত্ব শেষ বলে মনে করো, তা হলে আর বলার কিছুই নেই আমার।” একথা লিখে হাসিনা লিখেছে, তার কোনো ভুলের জন্য যদি তসলীম রাগ করে থাকে, তাহলে তাকে যেন ক্ষমা করে দেয় তসলীম।

তসলীমের বিরুদ্ধে হাসিনার দ্বিতীয় অভিযোগ, বিগত এক বছরে একদিনের জন্য সময় করেও সে শিশুকন্যা মানুষকে দেখতে আসেনি। তার অভিমানাহত জিজ্ঞাসা, শিশুকন্যা মানুষ এমন কি অপরাধ করেছে যে, আজ পর্যন্ত সে পিতার মুখ পর্যন্ত দেখতে পেলো না? হাসিনার ভাষায় এ অভিযোগ ছিল নিম্নরূপ— “, মানুষ এখন সব সময় বাবা বাবা বলে ডাকে। যে বাবাকে জন্মের পর থেকে এক বারটির জন্যেও দেখেনি, সে বাবার নামটাকেই প্রথম উচ্চারণ করেছে সে। কি আশ্চর্য দেখতো। আমি যদি কোন অপরাধ করে থাকি, না হয় আমার ওপর রাগ করেছে তুমি। কিন্তু, তোমার নবজাত শিশু, সেতো কোন অপরাধ করেনি। তাকে দেখবোর জন্যেও কি একবার বাড়ী আসতে পারো না তুমি?”

তসলীমের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ এক অভিযোগ উত্থাপন করেছে হাসিনা ভিন্ন এক চিঠিতে। তসলীমের বোন মিনু বড় হয়েছে, তাকে এখন বিয়ে দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু তসলীম বাড়ি না যাওয়ার কারণে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তাই হাসিনা খুবই চিন্তিত হয়ে তসলীমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। হাসিনার ভাষায়— “ওগো, আর কত দিন বাড়ী আসবে না তুমি? তুমি কি মাস মাস টাকা পাঠিয়েই শুধু নিশ্চিত থাকবে? মা যে তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলো।”

অর্থের অভাবে পরিবারের সকলের ঠিকমতো চিকিৎসা হচ্ছে না। অথচ এ ব্যাপারে তসলীম উদাসীন। তাই এ ক্ষেত্রেও সে তসলীমের বিরুদ্ধে অভিমানাহত হৃদয়ের অনুযোগ উত্থাপন করেছে। হাসিনার ভাষায় তার সে সাংসারিক দুরবস্থার ছবি— “আজ ক’দিন থেকে মিনুর জ্বর। আমারও শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না। কানু শেখ তার পাওনা টাকার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছে। মাইনে পাওয়া মাত্র টাকা পাঠিয়ে। ঘরে চাল-ডাল কিছুই নেই। এক বেলা আলু আর এক বেলা

ভাত খাচ্ছি।” এভাবে হাসিনা তার চিঠিতে একটার পর একটা অভিমানের কথা, অভিযোগের কথা উত্থাপন করেছে। প্রকৃত ঘটনা জানে না বলেই, তার অভিযোগগুলো ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে আলোচ্য গল্পে।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন



পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

- আপনার পঠিত গল্পটি থেকে পাঁচটি ইংরেজি, পাঁচটি আরবি-ফারসি এবং পাঁচটি তৎসম শব্দ শনাক্ত করুন।
- পঠিত ছোটগল্পটি থেকে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পাঁচটি শব্দ ও সন্ধি নিষ্পন্ন পাঁচটি শব্দ শনাক্ত করুন এবং প্রত্যয় ও সন্ধির সূত্র নির্দেশ করুন।
- নিচের প্রশ্নসূচক বাক্যগুলোকে হ্যাঁ-বোধক বাক্যে রূপান্তর করুন—
 - সে কি দেখতে ঠিক তার বাবার মতোই হয়েছে?
 - হাসিনার চিঠি হাতে নিয়ে তসলীমের কথা মনে পড়লো কেন আনোয়ার সাহেবের?
 - তুমি ছাড়া পরিবারে আর কেই বা আছে যে তার বিয়ে শাদীর বন্দোবস্ত করবে?
 - এ প্রহসন আর কতদিন চালাবেন তিনি?
 - ভাষাই যদি না থাকবে তো কবিতা লিখবো কি দিয়ে?
- নিচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে প্রতিশব্দ লিখুন
বাতাস, আগুন, আশ্চর্য, চুল, রক্ত।
- নিচের অংশটুকু সাধুভাষায় রূপান্তর কর—
সকাল থেকেই মেঘ মেঘ করছিলো সারা আকাশটা। দুপুর গড়াতেই বৃষ্টি নামলো জোরে। বাইরে শুধু বৃষ্টির একটানা রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে সে বৃষ্টির বেগ বাড়ছিলো। আবার কমছিলো। রাস্তায় পায়ে চলা পথিকের সাড়াশব্দ ছিলো না। শুধু দূর রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছিলো গানের টুকরো টুকরো কলি। অস্পষ্ট তার সুর। তবু বেশ লাগছিল তাঁর। আধপোড়া বিড়িটায় আগুন ধরিয়ে, ক্লাস্ত দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন আনোয়ার সাহেব।

প্রশ্ন : আপনার পঠিত গল্পটি থেকে পাঁচটি ইংরেজি, পাঁচটি আরবি-ফারসি এবং পাঁচটি তৎসম শব্দ শনাক্ত করুন।

উত্তর : ইংরেজি শব্দ – টিউশনি, অফিস, ইউনিভারসিটি, মেডিক্যাল কলেজ।

আরবি-ফারসি শব্দ – আনোয়ার, তসলীম, আলবত, বন্দোবস্ত, আম্মা।

তৎসম শব্দ – রাস্তা, সুর, সকাল, দৃষ্টি, রক্ত।

প্রশ্ন : নিচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে প্রতিশব্দ লিখুন—বাতাস, আগুন, আশ্চর্য, চুল, রক্ত।

উত্তর : বাতাস – বায়ু, হাওয়া, সমীর, সমীরণ, পবন।

আগুন – অগ্নি, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন।

আশ্চর্য – অবাক, অদ্ভুত, বিস্ময়, অপূর্ব, আজব।

চুল – কেশ, অলক, কুন্তল, কচ, চিকুর।

রক্ত – রুধির, শোণিত, লোহ, রস্য, অশ্র।

সৃজনশীল কাজ

একুশের প্রভাত ফেরিতে আপনার অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতামূলক একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করুন।

আরও যা পড়তে পারেন

একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে লেখা জহির রায়হানের “আরেক ফাল্গুন” উপন্যাসটি পড়তে পারেন।
সম্ভব হলে STOP GENOCIDE প্রামাণ্য চিত্রটি দেখুন।